বাংলা ব্যাকরণ। অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পর্ষদ-এর কথা

অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা ব্যাকরণের বই 'বাংলা ভাষাচর্চা' প্রকাশ করা হলো। এই 'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। ব্যাকরণ অংশ যেমন ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানকে নির্ভুল ও যথাযথ করবে, তেমনি নির্মিতি অংশ সাহায্য করবে তাদের সৃজনশীল লেখালিখির ক্ষেত্রে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা জোগাতে এবং ব্যাকরণের মতো তথাকথিত নীরস বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০১৬
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬
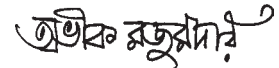
প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

অষ্টম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাচর্চা' পুস্তকটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাপাঠ' বইগুলির সম্প্রসারণ উচ্চ-প্রাথমিকের এই বই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক এই পুস্তকে ব্যাকরণের ধারণা এবং বিবিধ প্রয়োগকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার সারস্বত নিয়ামক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান

'বিশেষজ্ঞ কমিটি'

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৬

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চম তল

বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা

মিথুন নারায়ণ বসু ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অলয় ঘোষাল

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

ব্যাকরণ

নির্মিতি

প্রথম অধ্যায়

দল

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে কোনো শব্দের যেটুকু অংশ উচ্চারিত হয়, তাকে দল বা অক্ষর (Syllable) বলে। এখানে স্বল্পতম প্রয়াসের অর্থ হলো, ঝোঁক। অর্থাৎ একটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় যতবার ঝোঁকের প্রয়োজন হয়, তাতে ততগুলি দল বা অক্ষর থাকে। আবার কোনো কোনো শব্দ একবারেই উচ্চারিত হয় বা একটিই ঝোঁক থাকে; অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটিই দল বা অক্ষর থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক— যেমন : 'ব্যাকরণ' শব্দটি উচ্চারণ করতে তিনবার ঝোঁক দিতে হয়, ব্যা-ক-রণ্। ঠিক একইভাবে—

মাছ— মাছ্ (একটি দল)
দল— দল্ (একটি দল)
ছন্দ— ছন্-দ (দুটি দল)
বাংলা— বাং-লা (দুটি দল)
সম্মোহন—সম্-মো-হন্ (তিনটি দল)
কলকাতা—কল্-কা-তা (তিনটি দল)
ভারতবর্ষ— ভা-রত্-বর্-ষ (চারটি দল)
রবীন্দ্রনাথ— র-বীন্-দ্র-নাথ্ (চারটি দল)
বিবেকানন্দ—বি-বে-কা-নন্-দ (পাঁচটি দল)

উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এক বা একাধিক দল নিয়ে শব্দ গড়ে ওঠে। আর শব্দ যেমন একদল বিশিষ্ট হয়, তেমনই বহুদল বিশিষ্টও হয়ে [যেমন : পাখি (দুটি দল বিশিষ্ট), ধান (একদল বিশিষ্ট)] থাকে। এই দলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — ১. স্বরান্ত বা মুক্তদল (Open Syllable),২. ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল (Closed Syllable)।

১. স্বরান্ত বা মুক্তদল : যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকে বা যে দলে একটিই স্বরধ্বনি, তাকে স্বরান্ত বা মুক্তদল বলে। যেমন : আসে — আ-সে—এখানে দুটি দলই স্বরান্ত বা মুক্তদল। শেষে স্বরধ্বনি থাকায় এদের উচ্চারণ প্রলম্বিত হয়, তাই এরা মুক্ত দল।

২. **ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল :** যে দলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল বলে। যেমন : দুষ্ট — দুষ্‌-ট— এখানে ‘দুষ’- রুদ্ধ দল এবং ট - স্বরান্ত বা মুক্তদল। একইভাবে ‘মন্‌’, ‘মাছ’, ‘বল’, ‘চল’, ‘রাগ’ প্রভৃতি সব কয়টিই ব্যাঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদল। রুদ্ধদলের পরে আর কোনো ধ্বনি যুক্ত করা যায় না, তাহলেই দুটো দল হয়ে যায়। যেমন : মন্‌ + টা = মনটা (দুটি দল, মন - রুদ্ধদল/টা - মুক্তদল)

স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে অ, আ প্রভৃতি পূর্ণস্বর মুক্তদলের এবং আর, আউ, আও প্রভৃতি যুক্তস্বর রুদ্ধদলের মধ্যে পড়ে অন্যভাবে বলা যায়, যে পূর্ণস্বরের শেষে কোনো খণ্ডস্বরকে জায়গা দেওয়া গেলে তা মুক্তস্বর। কিন্তু যে পূর্ণস্বরের শেষে কোনো খণ্ডস্বর থাকায় আর কোনো খণ্ডস্বরকে জায়গা দেওয়া যায় না তা রুদ্ধদল। যেমন- ‘দা’ দলে খণ্ডস্বর হিসেবে ‘ও’ যুক্ত হতে পারে। তাই ‘দা’-মুক্তদল। কিন্তু ‘দাও’- দলে খণ্ডস্বর হিসেবে আর কোনো ধ্বনি যুক্ত হতে পারে না। তাই ‘দাও’ রুদ্ধদল।

এবার বিভিন্ন শব্দের দলের সংখ্যা এবং শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করা যাক :

আমার → আ - মার্‌ (দুটি দল : আ - মুক্তদল, মার্‌ - রুদ্ধদল)

আশৈশব → আ - শৈ - শব্‌ (তিনটি দল : আ - রুদ্ধদল, শৈ - রুদ্ধদল, শব - রুদ্ধদল)

গ্রামবাসী → গ্রাম্‌ - বা - সী (তিনটি দল : গ্রাম - মুক্তদল, বা - মুক্তদল, সী - মুক্তদল)

চন্দ্রবদনা → চন্‌ - দ্রো - ব - দ- না (পাঁচটি দল : চন্‌ - রুদ্ধদল, দ্রো - মুক্তদল, ব - মুক্তদল,দ- মুক্তদল, না - মুক্তদল)

নির্মূল → নির্‌ - মূল (দুটি দল : নির্‌ - রুদ্ধদল, মূল - রুদ্ধদল)

ভৈরব → ভৈ-রব্‌ (দুটি দল : ভৈ - রুদ্ধদল, রব্‌ - রুদ্ধদল)

ভুল → ভুল্‌ (একটি দল : ভুল্‌ - রুদ্ধদল)

মনচোরা → মন্‌ - চো - রা (তিনটি দল : মন্‌ - রুদ্ধদল, চো - মুক্তদল, রা - মুক্তদল)

---

১. ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ ব্যাকরণে দল শব্দটির অর্থ—

(ক) অক্ষর (খ) পাপড়ি (গ) জনতা (ঘ) বর্ণসমষ্টি।

১.২ আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। বাক্যটিতে মোট দলসংখ্যা হলো

(ক) ৪টি (খ) ৭টি (গ) ৯টি (ঘ) ১০টি।

১.৩ ‘উচ্চারণ’ শব্দটির দল বিশ্লেষণ করলে হবে—

(ক) উ-চ্চারণ (খ) উচ্-চা-রণ (গ) উদ্-চারণ (ঘ) উচ্চা-রণ।

২. **নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ ‘দল’ কাকে বলে?

২.২ দলের শ্রেণিবিভাগগুলি নির্দেশ করো।

২.৩ তিন রুদ্ধদল বিশিষ্ট একটি শব্দের দল বিশ্লেষণ করো।

২.৪ তিনটি দল রয়েছে এমন একটি শব্দ লেখো।

২.৫ মুক্তদল বলতে কী বোঝ?

২.৬ রুদ্ধদল-এর এমন নাম হওয়ার কারণ কী?

২.৭ হলন্ত শব্দ কাকে বলে?

২.৮ মুক্তস্বর কী?

২.৯ রুদ্ধস্বর বলতে কী বোঝ?

২.১০ মুক্ত দলকে স্বরান্ত অক্ষর বলা হয় কেন?

৩. **নীচের শব্দগুলির শেষ দলগুলির মধ্যে কোনটি রুদ্ধদল, কোনটি মুক্তদল তা লেখ :**

ব্যাকরণ	
জলছবি	
বাসযাত্রী	
তাৎপর্য	
পাকারাস্তা	
অকালবোধন	
সমাধান	
নবেন্দু	
টেনিদা	
কবিতা	

৪. **নীচের শব্দগুলির ‘দল’ বিশ্লেষণ করে কোন শব্দে কটি ‘দল’ আছে নির্দেশ করো :**

ধানদুর্বা, শ্যামলিমা, কণ্ঠস্বর, নৌকাডুবি, পাঁচফোড়ন, শীর্ষেন্দু, ধাঁধা, শেষ, আকাশপাতাল, আকস্মিক, বাতাস, অরণ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনি পরিবর্তন

আমাদের মধ্যে অনেকেই 'স্কুল'-কে বলি 'ইস্কুল', 'গ্লাস'-কে 'গেলাস' কিংবা 'বাক্স' না বলে 'বাস্ক', 'পিশাচ' না বলে 'পিচাশ'। কেন এমন হয়? এর পিছনে কি কোনও কারণ আছে, এমন বদলে যাওয়ার আছে কি নিজস্ব নিয়ম-নীতি? সে প্রশ্নের জবাব খোঁজার আগে আর একটি শব্দকে দেখা যাক। 'বিলাতি', এই একই শব্দকে 'বিলেতি' বা 'বিলিতি' বললে-লিখলেও কোনও মহাভারত-অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু হঠাৎ পাল্টানোর প্রয়োজনটা পড়ল কেন, এই প্রশ্ন যদি তোমার মনে ঘুরপাক খায় তবে চতুর্থ শ্রেণির 'ভাষাচর্চা' বইটি একবার খুলতে হবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 'ই' উচ্চ স্বরধ্বনি আর 'আ' নিম্ন স্বরধ্বনি, অর্থাৎ, এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ যথাক্রমে উপরে আর নীচে থাকে। এখন 'বিলাতি' বলার সময় জিভকে ই-আ-ই, অর্থাৎ উচ্চ-নিম্ন-উচ্চ অবস্থানে যেতে হয়। এই পরিশ্রম বাঁচানো যায় নিম্ন স্বরধ্বনিকে মধ্য-স্বরধ্বনিতে বদলে নিলে, অর্থাৎ, ই-এ-ই, 'বিলাতি' তাই হলো 'বিলেতি', আর 'বিলিতি' বললে তো আরোই সোনায় সোহাগা, জিভের খাটনি তখন কমবে সবচেয়ে বেশি।

ধ্বনি পরিবর্তনের মূল কারণ এইটিই, অর্থাৎ, উচ্চারণের সরলীকরণের প্রতি বাগযন্ত্রের সহজাত প্রবণতা। উচ্চারণস্থান-অনুযায়ী কাছাকাছি ধ্বনিগুলির সন্নিবেশ করে নিতে চাই আমরা। শক্ত উচ্চারণকে এভাবেই শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনিকে পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজ করে নিতে চাই। শব্দের অর্থ এতে অক্ষুণ্ণই থাকে, কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে, শব্দের বহিরঙ্গে ঘটে নানা রূপান্তর। ব্যাকরণে ও ভাষাতত্ত্বে এই বিষয়টিকেই বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন। ধ্বনি পরিবর্তনের পর্যায়টি আকস্মিক নয়, একটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উচ্চারণ-প্রবণতার অনুসারী এবং দীর্ঘমেয়াদী। ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগ।

ধ্বনি পরিবর্তনের তিনটি ধারা, যথাক্রমে : (ক) ধ্বনির আগম, (খ) ধ্বনি লোপ এবং (গ) ধ্বনির রূপান্তর। মনে রাখতে হবে, ধ্বনি বলতে এখানে স্বর ও ব্যঞ্জন, উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে। স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগমকে যথাক্রমে স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির লোপকে যথাক্রমে স্বরলোপ ও ব্যঞ্জনলোপ এবং স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তরকে যথাক্রমে স্বরসংগতি এবং ব্যঞ্জনসংগতি বা সমীভবন বলা হয়ে থাকে।

ধ্বনির আগম

আগেই বলা হয়েছে ধ্বনির আগমকে প্রধান দুটি ভাগে ফেলা যায়, স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম। আমরা প্রথমে স্বরের আগম নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে আসব ব্যঞ্জনাগমের কথায়।

● **স্বরাগম :** শব্দের আদি, মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার আগে, পরে বা মধ্যে একটি স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উচ্চারণ প্রয়াস হ্রাস করার প্রক্রিয়াকেই বলা যায় স্বরাগম। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, স্বরাগম হতে পারে তিন প্রকার। যথাক্রমে : আদি-স্বরাগম, মধ্য-স্বরাগম এবং অন্ত্য-স্বরাগম।

১. আদি স্বরাগম : শব্দের শুরুতেই যুক্তব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার্থে যুক্তব্যঞ্জনটির পূর্বে একটি সুবিধাজনক স্বরধ্বনির আগম ঘটে। একেই বলা হয় আদি-স্বরাগম। যেমন : স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্টেশন > ইস্টেশন ইত্যাদি।

২. মধ্য-স্বরাগম : শব্দের মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণ প্রয়াস কমানোর খাতিরে, সরলীকরণের প্রয়াসে অথবা ছন্দের কারণে যুক্ত ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে একটি স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শব্দের সৌকর্য বৃদ্ধির রীতিকে বলা যায় মধ্য-স্বরাগম। এইখানে স্বরধ্বনি-সহযোগে যুক্তব্যঞ্জনকে বিভক্ত করা হয় বলে মধ্য-স্বরাগমের অপর নাম 'স্বরভক্তি'। আবার এই প্রক্রিয়ায় শব্দের সৌকর্য তথা উৎকর্ষকে বিশেষরূপে ও প্রকৃষ্টভাবে বর্ধিত করা যায় বলে এই প্রক্রিয়াকে 'বিপ্রকর্ষ'-ও বলা হয়ে থাকে।

সচরাচর যেসব শব্দে 'র', 'ল', 'ন' ও 'ম' সংযুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন তৈরি করছে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় সেখানেই। যে স্বরধ্বনিগুলির আগম তার মধ্যে পড়ে : অ, ই, উ, এ এবং ও। যেমন ; কর্ম > করম, নির্মল > নিরমল, বর্ষণ > বরিষণ, মুক্তা > মুকুতা, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলোক ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য স্বরাগম : শব্দের অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের শ্রম কমাতে ও উচ্চারণের আড়ষ্টতাকে সহজ করার জন্য অতিরিক্ত যে স্বরধ্বনির আগম ঘটে, তাকে অন্ত্য-স্বরাগম বলা হয়। যেমন : নস্য > নস্যি, দুষ্ট > দুষ্টু, সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি ইত্যাদি।

● **ব্যঞ্জনাগম :** শব্দের মধ্যে অনেক সময় বাইরে থেকে একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এসে জায়গা করে নেয়। একে বলে ব্যঞ্জনাগম। স্বরাগমের মতোই ব্যঞ্জনাগমও আদি, মধ্য ও অন্ত্য, তিনস্থানেই হতে পারে। তবে বাংলাভাষায় আদি-ব্যঞ্জনাগম প্রায় দুর্লভ।

১. আদি-ব্যঞ্জনাগম : শব্দের আদি ও ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম কদাচিৎ ঘটে। বাংলা ভাষার বিশেষ আঞ্চলিক বৈচিত্র্যেই এমন দেখা যায়। যেমন : আম > রাম।

২. মধ্য-ব্যঞ্জনাগম : শব্দের মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, এমনকি না থাকলেও অনেক সময় একটি ব্যঞ্জনের আগম ঘটে। একে মধ্য ব্যঞ্জনাগম বলা যায়। যেমন : অম্ল > অম্বল, সুনর > সুন্দর, বানর > বান্দর, পোড়ামুখি > পোড়ারমুখি ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি : দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের আড়ষ্টতা কাটাতে অনেক সময় একটি ‘য়’ ধ্বনির আগম ঘটে। একে য়-শ্রুতি বলে। যেমন : দু’এক > দুয়েক, ছাআ > ছায়া, বাবুআনি > বাবুয়ানি, গোআলা > গোয়ালা ইত্যাদি।

ব-শ্রুতি : দুটি স্বরধ্বনি পরস্পর সন্নিহিত থাকলে উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেকসময় একটি অন্তঃস্থ-ব ধ্বনির আগম ঘটে থাকে। একে বলা হয় ব-শ্রুতি। যেমন : খাআ > খাবা, শোআ > শোবা (শোওয়া), ধোআ > ধোবা (ধোওয়া) ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য-ব্যঞ্জনাগম : শব্দের অন্তে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে কিংবা না থাকলেও অনেক সময় একটি ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। একে অন্ত্য-ব্যঞ্জনাগম বলা চলে। যেমন : বহু > বহুল, ধনু > ধনুক, নানা > নানান, সীমা > সীমানা, বটু > বটুক, জমি > জমিন, ফাট > ফাটল ইত্যাদি।

ধ্বনিলোপ

উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ কোনও ধ্বনির উপর বেশি জোর পড়ে। এর ফলে অন্য একটি ধ্বনি লুপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ধ্বনি-লোপ। ধ্বন্যাগমের মতো ধ্বনি-লোপও মূলত দু-প্রকার : স্বরধ্বনিলোপ ও ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ।

● **স্বরলোপ :** শব্দের অন্তর্গত কোনও স্বরধ্বনি লুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় স্বরলোপ। লুপ্ত স্বরধ্বনিটির স্থানানুসারে স্বরলোপ তিন প্রকার, যথাক্রমে, আদি-স্বরলোপ, মধ্য-স্বরলোপ এবং অন্ত্য-স্বরলোপ।

১. আদি-স্বরলোপ : শব্দের আদিতে অবস্থিত স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হলে তাকে আদি-স্বরলোপ বলা হয়। যেমন : অলাবু > অলাউ > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার, উডুম্বর > ডুমুর, অভ্যন্তর > ভিতর, অতসী > তিসি ইত্যাদি।

২. মধ্য-স্বরলোপ : শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম মধ্য-স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ। এইভাবে শব্দের সৌকর্য তথা উৎকর্ষ সম্যকভাবে ও প্রকৃষ্টরূপে বাড়ানো সম্ভব বলে ‘সম্প্রকর্ষ’ নাম দেওয়া হয়েছে। বিপ্রকর্ষের বিপরীত প্রক্রিয়া এটি। যেমন : জানালা > জানলা, বসতি > বস্তি, ভগিনী > ভগ্নী, নাতিনী > নাতনি, নারিকেল > নারকেল ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য-স্বরলোপ : শব্দের শেষে থাকা স্বরধ্বনির লোপকেই বলা হয় অন্ত্য-স্বরলোপ। বাংলা ভাষায় শব্দের অন্ত্য-অ প্রায়শই লোপ পায়। বস্তুত, বাংলাভাষার অন্যতম বিশিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণের মধ্যেই এটি পড়ে। আমরা লিখি ‘জীবন’, বলি ‘জীবন্’। লিখি ‘নর’, বলার সময় হয়ে যায় ‘নর্’। ভাষার বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াটি যে ক্রিয়াশীল তা দেখানো যায়। যেমন : হস্ত > হত্ত > হাত্, ভক্ত > ভত্ত > ভাত্ ইত্যাদি।

অন্ত্য-অ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও লুপ্ত হওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যেমন : রাত্রি > রাতি > রাত্, খানি > খান্ ইত্যাদি। এছাড়া, বাংলা সন্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বরলোপ ঘটে। যেমন : কাঁচা + কলা = কাঁচকলা , মিশি + কালো = মিশকালো।

● **ব্যঞ্জনলোপ :** পদের আদি-মধ্য বা অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনিযুক্ত বা স্বরধ্বনিবিহীন কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যঞ্জনলোপ। স্বরধ্বনির লোপের মতোই ব্যঞ্জনধ্বনিলোপকেও তিনটি প্রকারে বিভাজন করা সম্ভব, যথাক্রমে : আদি-ব্যঞ্জনলোপ, মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ এবং অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ।

১. **আদি-ব্যঞ্জনলোপ :** শব্দের আদিতে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ পাওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় আদি-ব্যঞ্জনলোপ। যেমন : স্থান > থান, স্ফটিক > ফটিক, রুই > উই, স্পর্শ > পরশ ইত্যাদি।

২. **মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ :** শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পাওয়ার ঘটনাকে মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন : ফাল্গুন > ফাগুন, গোষ্ঠ > গোঠ, অশ্বত্থ > অশথ, কার্পাস > কাপাস, কর্ম > কম্ম, শৃগাল > শিয়াল, বেহাই > বেয়াই ইত্যাদি।

৩. **অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ :** শব্দের শেষে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ বলা যায়। যেমন : গাত্র > গা, বড়দাদা > বড়দা, মেজদিদি > মেজদি, ছোটোদাদা > ছোড়দা, বউদিদি > বউদি, গাহে > গায় ইত্যাদি। বাংলার সন্ধির সময় অনেকক্ষেত্রে ব্যঞ্জনলোপও ঘটে। যেমন : জগৎ + জন = জগজন, জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু ইত্যাদি।

ধ্বনির রূপান্তর

ধ্বনির আগম ও লোপ ছাড়া ধ্বনি পরিবর্তনের তৃতীয় এবং অন্যতম প্রধান কারণ ধ্বনির রূপান্তর। শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনির একের অপরের প্রভাবে রূপান্তর অথবা পরস্পরের প্রভাবে ধ্বনির রূপান্তরের বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রধান পাঁচটি ধারা হলো—

- অপিনিহিতি
- অভিশ্রুতি
- স্বর-সংগতি
- ব্যঞ্জন সংগতি বা সমীভবন
- ধ্বনি-বিপর্যয় বা বিপর্যাস

● **অপিনিহিতি :** শব্দের মধ্যে ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি থাকলে অনেক সময় তাদের যথানির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থানের ঠিক আগে উচ্চারিত হওয়ার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এই রীতিকে ‘অপিনিহিতি’ বলা হয়। অপিনিহিতি-নামটির মধ্যেই প্রক্রিয়াটির ইঙ্গিত রয়েছে। ‘অপি’ উপসর্গটির অর্থ ‘আগে’ বা ‘পূর্বে’, আর ‘নিহিতি’ শব্দের অর্থ সন্নিবেশ বা নিয়ে আসা। অপিনিহিতি বলতে তাই বোঝায়, ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনির যথাবিহিত অবস্থানের পূর্বে অবস্থান। যেমন, (করিয়া = ক + অ + র্ + ‘ই’ + য্ + আ > ক + অ + ‘ই’ + র্ + য্ + আ + কইর‍্যা) উদাহরণটিতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ‘ই’ ধ্বনিটি ‘র্’-এর পরে উচ্চারিত না হয়ে টপকে ‘র’-এর আগে চলে এসেছে। একই রকমে হয়, চলিয়া > চইল্যা, বলিয়া > বইল্যা।

ই-কারের অপিনিহিতি : রাতি > রাইত, আজি > আইজ, কালি > কাইল, চারি > চাইর, ভাবিয়া > ভাইব্যা, বাদিয়া > বাইদ্যা ইত্যাদি।

উ-কারের অপিনিহিতি : চক্ষু > চউখ, সাধু > সাউধ, জলুয়া > জউলুয়া, মাছুয়া > মাউছুয়া, নাটুয়া > নাউটুয়া ইত্যাদি।

য [ই + অ] -ফলার অন্তর্গত ই-কারের অপিনিহিতি: তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, স্বরসন্ধিতে ই + অ = য(্য) হয়, তাই শব্দে য-ফলা থাকলে সেখানেও অপিনিহিতি সম্ভব। যেমন : কন্যা > কইন্যা

[ক + অ + ন্ + 'ই' + আ > ক + অ + 'ই' + ন্ + ই + আ)

একই রকমে, কাব্য > কাইব্য, সত্য > সইত্য, পথ্য > পইথ্য ইত্যাদি।

ক্ষ ও জ্ঞ থাকলে অপিনিহিতি : বাংলা ভাষায় 'ক্ষ'-র উচ্চারণ 'খিয়' আর 'জ্ঞ'-র উচ্চারণ অনেকটা যেন 'গ্যঁ'। এর কারণে শব্দে 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে অপিনিহিতি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন : লক্ষ > লইকখ, যক্ষ > যইকখ, যজ্ঞ > যইগগোঁ ইত্যাদি।

- **অভিশ্রুতি :** অপিনিহিতির পরের স্তরটি হলো অভিশ্রুতি। অপিনিহিতির কারণে পূর্বে উচ্চারিত 'ই' বা 'উ' সন্নিহিত স্বরধ্বনিগুলিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেরাও প্রভাবিত হয়ে চলিত বাংলায় ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে অভিশ্রুতি বলে।

অভিশ্রুতির প্রক্রিয়াটি কীভাবে সংঘটিত হয়, দেখা যাক :

আমরা আগেই জেনেছি যে, ভাষার বিবর্তনে অপিনিহিতি হলো অভিশ্রুতির পূর্ববর্তী স্তর।

অর্থাৎ, করিয়া > কইর‍্যা > করে

[ক + অ + র্ + ই + য্ + আ] > [ক + অ + ই + র্ + য্ + আ] > [ক্ + অ + র্ + এ]

(অপিনিহিতি) > (অভিশ্রুতি)

এখানে দ্রষ্টব্য যে, আগে চলে আসা 'ই' ধ্বনিটি আশপাশের ধ্বনিগুলির প্রভাবে এবং নিজেও তাদের প্রভাবে কীভাবে বদলে যাচ্ছে। অভিশ্রুতি সচরাচর 'অ' এবং 'আ' ধ্বনির সঙ্গে 'ই' ও 'উ' ধ্বনির মিলনে ঘটে। এর কতগুলি প্রকারভেদ হতে পারে :

[অ + ই > ও] : বলিয়া > বইল্যা > বলে, ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে, চলিতে > চইলতে > চলতে, করিতে > কইরতে > করতে ইত্যাদি।

[আ + ই > আ, এ] : আজি > আইজ > আজ, গাঁঠি > গাঁইট > গাঁট, ভাবিয়া > ভাইব্যা > ভেবে, বাদিয়া > বাইদ্যা > বেদে ইত্যাদি।

[অ + উ > ও] : জলুয়া > জউলুয়া > জোলো, চক্ষু > চউখ > চোখ, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

[আ + উ > এ] : ভাতুয়া > ভাউতুয়া > ভেতো, মাঠুয়া > মাউঠুয়া > মেঠো, মাছুয়া > মাউছুয়া > মেছো, নাটুয়া > নাউটুয়া > নেটো (লেটো) ইত্যাদি।

- **স্বরসংগতি :** শব্দের মধ্যে একাধিক স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে একটি সংগতিসাধন করে। অর্থাৎ, বিষম স্বর থাকলে তাকে সমস্বরে পালটে ফেলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সঙ্গতিসাধনের এই প্রবণতাকেই বলা হয় স্বরসংগতি। এই নামটি আচার্য সুনীতিকুমার-প্রস্তাবিত।

তোমাদের জানা আছে যে, স্বরধ্বনিগুলিকে উচ্চারণস্থান-অনুযায়ী উচ্চ-মধ্য-নিম্ন কিংবা সম্মুখস্থ-পশ্চাৎভাগস্থ এবং উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী প্রসারিত-কুঞ্চিত অথবা সংবৃত-বিবৃত প্রভৃতি প্রকারে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এও তোমরা জানো যে, জিভ সবসময় চায় কাছাকাছি থাকা ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ করে পরিশ্রম কমাতে। এই কারণেই কোনও শব্দে যদি উচ্চারণের স্থান ও প্রকার-অনুযায়ী দূরের দুটি স্বর পাশাপাশি থাকে, জিভ তবে চেষ্টা করবে একটি স্বরকে উপেক্ষা করে অন্য স্বরটির সদৃশ বা কাছাকাছি স্বরধ্বনি দিয়ে উপেক্ষিত স্বরটিকে প্রতিস্থাপন করতে। যেমন, উনান > উনোন > উনুন। এই উদাহরণে 'উ' (উচ্চ, ওষ্ঠ্য, কুঞ্চিত, সংবৃত স্বরধ্বনি)-র পর 'আ' (নিম্ন, কণ্ঠ্য, বিবৃত) উচ্চারণ করতে জিভকে অনেক বেশি নড়াচড়া করতে হচ্ছিল। 'উনোন' বললে 'ও' (উচ্চ-মধ্য, কণ্ঠোষ্ঠ্য, কুঞ্চিত,সংবৃত)-ধ্বনিটি 'উ'-এর অনেক কাছাকাছি থাকার কারণে জিভের পরিশ্রম অনেক বাঁচে। আর খাটনি সবচেয়ে কমানো যায় 'উনুন' বললে। এখানে পূর্ববর্তী স্বরটি নিজের প্রভাব খাটিয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনিটিকে শুধু পালটেই ফেলেনি নিজের অনুরূপ ও অভিন্ন করে তুলেছে।

স্বরসংগতির দুটি প্রকারভেদ সম্ভব— ১.পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন, ২. পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন।

১. পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন :

১. পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ' ধ্বনি 'ও'-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : তুলা > তুলো, বুড়া > বুড়ো, ছুতার > ছুতোর, দুয়ার > দুয়োর ইত্যাদি।

২. পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনি 'এ' -ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : ভিক্ষা > ভিক্ষে, মিথ্যা > মিথ্যে, হিসাব > হিসেব, বিকাল > বিকেল ইত্যাদি।

৩. পূর্ববর্তী 'ই'-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনি 'ই' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : বিলাতি> বিলিতি, বিনা > বিনি, ভিখারি > ভিখিরি, বিকাকিনা > বিকিকিনি ইত্যাদি।

৪. পূর্ববর্তী 'উ'-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির 'উ'-ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন : উনান > উনুন, ধুনাচি > ধুনুচি, কুড়াল > কুড়ুল, উড়ানি > উড়ুনি ইত্যাদি।

৫. পূর্ববর্তী 'ঔ' (ও + উ)-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির 'ও'-ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটে। যেমন : নৌকা > নৌকো, চৌকা > চৌকো ইত্যাদি।

২. পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন :

১. পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'উ'-ধ্বনি 'ও'-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : উড়া > ওড়া, মুলা > মোলা, শুনা > শোনা, বুঝা > বোঝা ইত্যাদি।

২. পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনি 'এ'-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : লিখা > লেখা, মিলা >মেলা, শিয়াল > শেয়াল, পিয়ালা > পেয়ালা ইত্যাদি।

৩. পরবর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'এ'-ধ্বনির 'ই'-ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন : দেশি > দিশি, বেটি > বিটি ইত্যাদি।

৪. পরবর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'আ'-ধ্বনিরও 'ই' ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন : সন্ন্যাসী > সন্নিসি।

৫. পরবর্তী 'ই' বা 'উ'-ধ্বনির কারণে পূর্ববর্তী 'অ'-ধ্বনির পরিবর্তে 'ও' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বস্তুত, বাংলা ভাষার এটি একটি বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ। যেমন :

কবি > কোবি, মন > মোন, অপু > ওপু, মধু > মোধু ইত্যাদি।

৬. পরে 'ক', 'খ', 'ঙ', 'চ' বা 'ল'-ধ্বনি থাকলে এক অক্ষর (Syllable) -বিশিষ্ট শব্দের আদিতে থাকা 'এ'-ধ্বনিটি অনেক সময় 'অ্যা'-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : এক > অ্যাক দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রেও 'ক' , 'খ', 'ঙ', 'চ' বা 'ল' ধ্বনির সঙ্গে আ-কার যুক্ত থাকলে শব্দের আদিস্থিত 'এ'-ধ্বনিটি পালটে 'অ্যা'-ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন : একা > অ্যাকা, দেখা > দ্যাখা, ঢেঙা > ঢ্যাঙা, বেচা > ব্যাচা, মেলা > ম্যালা ইত্যাদি।

• **ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন :** ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একে অপরকে, অথবা উভয়েই পরস্পরকে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করে। একেই বলা হয় ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন। পূর্ববর্তী 'ধ্বনি পরবর্তী' ধ্বনিকে রূপান্তরিত করলে তাকে বলে প্রগত সমীভবন। পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তিত করলে তাকে বলে পরাগত সমীভবন। পরস্পরের প্রভাবে উভয়েরই রূপান্তর ঘটলে তাকে বলা হয় অন্যোন্য সমীভবন।

১. প্রগত ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন : পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আকার প্রাপ্ত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলা হয়। যেমন :

(পদ্ম = প + অ + দ + ম + অ > প + অ + দ + দ + অ = পদ্দ) এখানে লক্ষণীয়, পরবর্তী 'ম' ধ্বনি পূর্ববর্তী 'দ'-ধ্বনির সদৃশ হয়ে যাচ্ছে। এই রকমে,

পক্ব > পক্ক, চন্দন > চন্নন, কুলিয়ে > কুললে।

২. পরাগত ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন : পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'অসম ব্যঞ্জনধ্বনিটির পরবর্তী' ব্যঞ্জনের রূপ ধারণকে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন, (কর্ম = ক + অ + 'র' + ম + অ > ক + অ + 'ম' + ম + অ = কম্ম) লক্ষণীয়, এখানে পূর্ববর্তী 'র' ধ্বনি পরবর্তী 'ম'-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। একই রকমে, কর্তা > কত্তা, রাঁধনা > রান্না, কর্পূর > কপপূর, যতদূর > যদ্দূর ইত্যাদি।

৩. অন্যোন্য ব্যঞ্জন-সংগতি বা সমীভবন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করে রূপান্তরিত হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলা হয়ে থাকে। যেমন, উৎশ্বাস > উচ্ছ্বাস, মহোৎসব > মোচ্ছব, তৎহিত > তদ্ধিত, চারটি > চাড্ডি, বৎসর > বচ্ছর ইত্যাদি।

● **ধ্বনি-বিপর্যয় :** উচ্চারণকালে বিপর্যয়জনিত কারণে শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনিগুলির স্থান পরিবর্তিত হলে তাকে ধ্বনি-বিপর্যয়, স্থিতি-পরিবৃত্তি বা বিপর্যাস নামে ডাকা হয়। অর্থাৎ, এককথায় বলা যায় যে, উচ্চারণের ভুলে ধ্বনির স্থান অদল-বদল হয়ে যাওয়াকেই ধ্বনি-বিপর্যয় বলা চলে। যেমন : হ্রদ > হদ > দহ, রিকশা > রিশকা, আলনা > আনলা, মুকুট > মুটুক, তলোয়ার > তরোয়াল ইত্যাদি।

---

১. **ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

১.১ যুক্তি > যুকতি হলো —

(ক) স্বরভক্তির উদাহরণ (খ) মধ্য স্বরাগমের উদাহরণ

(গ) স্বরসংগতির উদাহরণ (ঘ) অপিনিহিতির উদাহরণ।

১.২ ইঞ্জ > ইঞ্জি — এক্ষেত্রে ঘটেছে —

(ক) মধ্যস্বরলোপ (খ) স্বরসংগতি (গ) অন্ত্যস্বরলোপ

(ঘ) অন্ত্যস্বরাগম।

১.৩ জানালা থেকে জানলা হয়েছে —

(ক) অভিশ্রুতির কারণে (খ) প্রগত সমীভবনের কারণে

(গ) অন্যোন্য সমীভবনের কারণে (ঘ) মধ্যস্বরলোপের কারণে।

১.৪ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে বলা হয় —

(ক) মধ্যগত স্বরসংগতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) প্রগত স্বরসংগতি (ঘ) সমীকরণ।

১.৫ ধোঁকা > ধুঁকো হলো। এক্ষেত্রে ঘটেছে —

(ক) অন্যোন্য সমীভবন (খ) অন্যোন্য স্বরসংগতি

(গ) অপিনিহিতি (ঘ) মধ্যস্বরাগম।

১.৬ শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 'ই' কার বা 'উ' কারকে সেই ব্যঞ্জনধ্বনির আগেই উচ্চারণ করার রীতিটি হলো —

(ক) অভিশ্রুতি (খ) ব্যঞ্জনসংগতি (গ) অপিনিহিতি (ঘ) বিপর্যাস।

১.৭ রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে। এক্ষেত্রে ঘটেছে —

(ক) ধ্বনিবিপর্যয় (খ) মধ্যস্বরলোপ (গ) অন্ত্যস্বরলোপ (ঘ) অভিশ্রুতি

১.৮ সমাক্ষরলোপের একটি দৃষ্টান্ত হলো —

(ক) ফলাহার > ফলার (খ) বড়দিদি > বড়দি (গ) পোষ্য > পুষ্যি (ঘ) দেশি > দিশি

১.৯ গাত্র > গা। এটি —

(ক) অন্তব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ

(খ) মধ্যগত স্বরসংগতির উদাহরণ

(গ) অন্যোন্য স্বরসংগতির উদাহরণ

(ঘ) সমাক্ষরলোপের উদাহরণ।

১.১০ একাধিক ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার যোগফল হলো —

(ক) য়-শ্রুতি (খ) অপিনিহিতি (গ) অভিশ্রুতি (ঘ) ব-শ্রুতি

২. **নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ ধ্বনি পরিবর্তনের মূল কারণগুলি উল্লেখ করো।

২.২ 'স্বরাগম' বলতে কী বোঝ?

২.৩ মধ্যস্বরাগমের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করো।

২.৪ শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জনাগম ঘটেছে এমন একটি উদাহরণ দাও।

২.৫ ব-শ্রুতি ঘটার কারণ কী?

২.৬ ভক্ত > ভত্ত— এক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মটি লক্ষ করা যায়?

২.৭ অভিশ্রুতিকে অপিনিহিতির পরবর্তী স্তর বলা হয় কেন?

২.৮ সমীভবনকে ব্যঞ্জনসংগতি বলার কারণ কী?

২.৯ 'ক্ষ' ও 'জ্ঞ' এই দুই ক্ষেত্রে কীভাবে অপিনিহিতি লক্ষ করা যায়?

২.১০ ধ্বনিবিপর্যয় বলতে কী বোঝ?

তৃতীয় অধ্যায়

বাক্যের ভাব ও রূপান্তর

ভাষা ভাবের বাহন। অর্থাৎ আমাদের মনের বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ এবং আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যেই আবিষ্কার হয়েছে ভাষার। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, গঠন-অনুযায়ী বাক্যকে কীভাবে সরল, যৌগিক ও জটিল — এই তিন শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এই বিভাজন সম্পূর্ণ গঠন-নির্ভর এবং বাক্যে বিভিন্ন পদের অন্বয় ও একাধিক খণ্ডবাক্য/আশ্রয় বাক্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির মুখাপেক্ষী। বাক্যের আলোচনায় এর গঠনের মতোই অন্য একটি প্রসঙ্গও কিন্তু নিতান্ত আবশ্যিক। তা হলো এর অর্থ বা ভাবের বিষয়। উক্ত বাক্যের বক্তব্য বিষয় বা ঘটনাটির প্রতি বক্তা-মানুষটির মনোভাবের কথাই এখানে বুঝতে হবে। আর এই ভাব (ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Mood) - বিষয়ক আলোচনাকে ব্যাকরণে খুবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। কারণ, বাস্তব পরিস্থিতিতে ভাব আদানপ্রদানের সূত্রে আমরা যে বাক্যগুলি ব্যবহার করে থাকি, তার সঙ্গে অবধারিতভাবে যুক্ত থাকে চোখ, মুখ, মাথা, হাত, কাঁধ প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালন ও বিভিন্ন ভঙ্গি এবং নানা-ধরনের স্বরপ্রক্ষেপণ। মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' বোঝানো, হাত নেড়ে কাছে আসতে বলার এই ভঙ্গিগুলিকে বলা হয় Para-language বা প্রায়-ভাষা। বাস্তব জীবনে এদের ব্যবহার সমধিক। একই বাক্য বিভিন্ন স্বরভঙ্গিতে বলে, দ্রুত কিংবা ধীরভাবে, ফিসফিস করে অথবা গর্জন করে বলে বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাবের উদ্দীপন করা সম্ভব। এই বলার ধরনটি থেকেই উক্ত বাক্যে বর্ণিত বিষয় বা ঘটনাটির প্রতি বক্তার মনোভাবের হদিশ পাওয়া সম্ভব। তোমাদের মনে পড়তে পারে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য 'পটলবাবু ফিল্মস্টার'-গল্পটির কথা; মাত্র একটি শব্দের সংলাপ বলার সুযোগ পেয়ে প্রাথমিক ভাবে হতাশ পটলবাবু কীভাবে ওই একটি শব্দের অসীম সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন—

' আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ— পটলবাবু বারবার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে, চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠান্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরও আরেকরকম আঃ। এছাড়া

আরও কতরকম আঃ রয়েছে — দীর্ঘকালের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোটো করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আঃ-, চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়াগলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ-টাকে খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হলো তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।'

যে কোনো কথিত বাক্যের ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। লিখিত বা মুদ্রিত-রূপে বাক্যের এই ভাবের দিকটি প্রকাশ করা বেশ কঠিন। উদ্ধৃতি চিহ্নের সার্থক ব্যবহার এবং বক্তার মনোভাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া লেখক এক্ষেত্রে বস্তুত নিরুপায়। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথোপকথনের প্রসঙ্গ সূত্রে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া পাঠকেরও অন্য রাস্তা খোলা থাকে না। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা বাক্যের গঠনগত আলোচনার সূত্রেই অস্ত্যর্থক (অস্তি+অর্থক) বা হ্যাঁ-বাচক বাক্য এবং নঞর্থক বা না-বাচক বাক্য সম্বন্ধে জেনেছিলে। বাক্যের ভাব বা অর্থ-ভিত্তিক প্রকার ভেদের আলোচনাতেও এই দুইপ্রকার বাক্য নিয়ে কিন্তু কথা বলা জরুরি।

বাক্যের অর্থভিত্তিক প্রকারভেদ

● **অস্ত্যর্থক বাক্য ও নঞর্থক বাক্য :** অস্ত্যর্থক বাক্য বা হ্যাঁ-বাচক বাক্যে গঠন যেমন অস্ত্যর্থক বা সদর্থক হয়, তেমনই অর্থের দিক থেকেও এই প্রকার বাক্যে একটি স্বীকৃতির ভাব থাকে।

অপর দিকে নঞর্থক বাক্যে নঞর্থক গঠনের সঙ্গে অর্থগতভাবে কোনও কিছু অস্বীকৃতির ব্যঞ্জনা কাজ করে। বাংলা ভাষায় বাক্যকে নেতিবাচক করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় দুটি শব্দ— 'না' এবং 'নয়'।

না-শব্দটির ব্যবহার অনেকটা ক্রিয়াবিশেষণের মতো। 'যাব না', 'খাব না' প্রভৃতি উদাহরণে দেখা যাবে 'না' যেন তার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াটির দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করছে।

না-শব্দ সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন - 'না জানিয়ে যেও না।' অবশ্য মনে রাখা দরকার, প্রাচীন বাংলাতে এই 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার আগেই বসত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- নামের আদি-মধ্যযুগের একটি বাংলা বইয়ে দেখব এইরকম বাক্য— 'সো এহি পথে মহাদানী না বলয়ো।' নঞর্থক বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে 'না'-বসা বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বিবর্তনের ফল।

না-শব্দের অতীতকালবোধক রূপ হলো 'নি'; যেমন, যাইনি, খাওনি, বলেনি প্রভৃতি। অতীতকালে না > নি

যে-সব প্রশ্নের উত্তর কেবল হ্যাঁ/না হয় সেইসব ক্ষেত্রে অতীতকাল হলেও নেতিবাচক প্রশ্নটিতে 'না'-শব্দই ব্যবহৃত হয়, 'নি' নয়। যেমন, 'বিদ্যাসাগরও কি ছোটোবেলায় দুষ্টু ছিলেন না?'

নয়-শব্দটির ব্যবহার একটু ভিন্নরকম। 'নয়' মূলত নামপদের পরে বসে; যেমন, 'এ তোমার কাজ নয়।'

অনেকসময় 'এমন নয়', 'তা নয়' প্রভৃতি গঠন তৈরি করে বাক্যকে জটিলরূপ দেওয়া হয়। যেমন,

'এমন নয় যে আমি পড়তে খুব ভালোবাসি।'

বা

'মনে ভাবনা ছিল না তা নয়।'

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে দেখব, দু'প্রকার না-বাচক শব্দ ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ কিন্তু অস্ত্যর্থক, অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক হয়ে গেছে।

- **নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক বাক্য :** এই ধরনের বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাবের বিবৃতি থাকে। কোনো ভাব বা ঘটনার বিবরণের অতিরিক্ত বিশেষ কোনো মনোভঙ্গি প্রকাশ না পেলেও এই ধরনের বাক্যে বক্তার নিশ্চয়তার বোধটি বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে। যেমন,

'ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে।'

'তাঁর একলার অমতে কিছু আসে যায় না।'

উপরের উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট যে, বিবৃতিমূলক বাক্য অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে সদর্থক বা অস্ত্যর্থক নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন,

'টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।'

আর, যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাবের অস্তিত্ব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়, তাকে নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য বলা হয়। যেমন,

'আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে আসি নাই।'

- **প্রশ্নবোধক বাক্য :** এই বাক্যগুলি বক্তার প্রশ্নসূচক প্রকাশের নিদর্শন। এই ধরনের বাক্যে কোনো ভাব, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে কোনো একটি জিজ্ঞাসার ভাব প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন,

'তোমরা কেউ খুশ-হাল খাঁ খট্টকের গজল জানো?'

'দরজা খুলছিল না কেন?'

অর্থাৎ, প্রশ্নবোধক বাক্যও অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। তবে এই নিয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনার অবকাশ আছে।

প্রশ্নসূচক প্রকাশের দুটি বিশিষ্ট ধরন আছে: ১. 'ক' প্রশ্ন বা Wh. Questions এবং ২. হ্যাঁ/না - প্রশ্ন

১. ক-প্রশ্ন বা Wh-Questions এর মধ্যে পড়বে কী, কেন, কীভাবে, কারা, কোথায়, কখন, কবে, কেমন করে প্রভৃতি অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বনাম বা বিশেষণ-সহযোগে প্রশ্ন তৈরির কৌশল। বাংলার যেমন এই প্রশ্নবাচক উপাদানগুলি 'ক' দিয়ে শুরু, ইংরাজিতে when, where, what, which,

whom প্রভৃতি প্রশ্নসূচক উপাদানগুলি 'Wh' দিয়ে শুরু হয়। এই কারণেই এদের মাধ্যমে তৈরি প্রশ্নগুলিকে ক-প্রশ্ন বা Wh-Question বলা হয়ে থাকে।

যেমন, 'কোথায় গেছিলে?'
'বেগুন ছাড়া আর কী খাও না?'
'ক-খানা বই রে?'

এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্নবাক্যের গঠন অস্ত্যর্থক হলে তার অর্থও অস্ত্যর্থক হয়। আর গঠন নঞর্থক হলে অর্থও নঞর্থক হয়ে যায়। উপরের উদাহরণে যেমন প্রথম আর তৃতীয় প্রশ্নবাক্যটি অস্ত্যর্থক, দ্বিতীয় বাক্যটি নঞর্থক।

২. হ্যাঁ/না-প্রশ্ন : এই জাতীয় প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর উত্তর সর্বদাই হ্যাঁ অথবা না হয়। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কী খাবে? তখন এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে অজস্র, অসংখ্য।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, খাবে কি?

তখন উত্তর হতে পারে কেবল হ্যাঁ অথবা না।

লক্ষণীয়, প্রথম উদাহরণটি ক-প্রশ্নের নিদর্শন। এক্ষেত্রে প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কী' সবসময় ক্রিয়ার আগে বসে থাকে।

অপরদিকে, দ্বিতীয় উদাহরণে 'কি' অব্যয়টি বাক্যের শেষে বসে ক্রিয়া সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তৈরি করেছে।

এই ধরনের প্রশ্নে গঠন অস্ত্যর্থক হলেই অর্থও সদর্থক হবে, এমন বলা যায় না। উল্টোটাও সত্যি, অর্থাৎ নঞর্থক গঠনের প্রশ্ন অর্থগত ভাবে অস্ত্যর্থক হতেই পারে। যেমন, 'দেশের এই দুর্দিনে তুমি কি চুপ করে বসে থাকবে?'

উপরের প্রশ্নটির গঠন অস্ত্যর্থক হলেও নেতিবাচক উত্তরের প্রত্যাশা প্রশ্নটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আবার যদি বলি, 'এই বিপদে তুমি কি নিজেকে জনসেবায় নিয়োজিত করবে না?' তাহলেও দেখব প্রশ্নটির গঠন যতই নঞর্থক হোক, এর অন্তরে প্রবল সদর্থকতা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্নসূচক প্রকাশের অন্য ধরনগুলির মধ্যে পড়ে, যথাক্রমে—

৩. লগ্নপ্রশ্ন : কথ্য বিষয়ে সমর্থন আদায়ের জন্য যে লেজুড় প্রশ্ন ব্যবহার করা হয় তাকেই লগ্ন প্রশ্ন বলা হয়। যেমন,

'তুমি যাবে, তাই তো?'

কেমন, না, তাই না, আচ্ছা, নাকি প্রভৃতি অব্যয় যোগে এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয়ে থাকে।

৪. সামাজিক আলাপচারিতার প্রশ্ন : এর মূল লক্ষ্য সৌজন্যপ্রকাশ। ব্যাকরণ-সঙ্গত হলেও আসলে এগুলো ছদ্ম-প্রশ্ন, যেমন, 'ভালো আছেন তো?'
'কি, বাজারে চললেন?' ইত্যাদি।

৫. প্রতিস্পর্ধামূলক প্রশ্ন : এই ধরনের প্রশ্নে বক্তার প্রতিস্পর্ধী ভাবটি ফুটে ওঠে, এই ক্ষেত্রেও গঠন ও অর্থের মধ্যে সংগতি না-ই থাকতে পারে। যেমন,

'আমি কি ডরিব সখি ভিখারি রাঘবে?'

'কই দেখি কী পড়েছ?'

উপরের দুটি উদাহরণেই দেখব গঠন অস্ত্যর্থক হলেও নেতিবাচক উত্তর এই স্পর্ধিত প্রকাশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

● **বিস্ময়সূচক বাক্য :** এই ধরনের বাক্যে প্রকাশিত হয় মনের দুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি আবেগ ও তজ্জনিত নানাবিধ উচ্ছ্বাস। যেমন,

'আঃ, কী আরাম!'

'আহা, কী দেখিলাম!'

'এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম!'

'আমি কিছুতেই যাব না!' ইত্যাদি।

বিস্ময়সূচক বাক্যও অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক — উভয়ই হতে পারে।

● **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :** এই ধরনের বাক্যে প্রকাশ পায় আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা বা নিষেধ ইত্যাদির ভাব। এই ধরনের বাক্যে বক্তব্য বিষয়টির মধ্য দিয়ে বক্তার ইচ্ছা, নির্বাচন অথবা নৈতিক অবস্থানটি সূচিত হয়। বক্তার ইচ্ছার অনুরূপ বক্তব্যই জ্ঞাপিত হয় বলে এই ধরনের বাক্যের নাম অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। অনুজ্ঞাবাচক বাক্যও গঠন ও ভাবের দিক থেকে অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক হয়ে থাকে। যেমন,

'এগিয়ে চলো।'

'বৃথা সময় নষ্ট করো না'

'দেখিস, আমাদের ভুলিস নে।'

উপরের প্রথম তিনটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে, অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে ক্রিয়াপদ মধ্যম পুরুষ বা তুমি-পক্ষের সাধারণ রূপে থাকলে, অর্থাৎ 'তুই' বা 'আপনি'-রূপে না থাকলে, ক্রিয়াটির সঙ্গে প্রায়ই 'ও'-কার যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'।

বাংলায় ভাব অনুযায়ী বাক্যের আরও কিছু প্রকারভেদ করা যায়। যেমন, ইচ্ছাবোধক বাক্য, শর্তসূচক বাক্য প্রভৃতি। এইগুলি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা যাবে। আপাতত একটি ছকের মাধ্যমে বাংলা বাক্যের ভাবগত প্রকৃতি-অনুসারে প্রধান আট প্রকারের বাক্যগুলিকে সাজিয়ে ফেলা যাক :

	নির্দেশক/বিবৃতিমূলক	
অস্ত্যর্থক	প্রশ্নবোধক	নঞর্থক
	বিস্ময়সূচক	
	অনুজ্ঞাবাচক	

অর্থের ভিত্তিতে বক্যের রূপান্তর-সাধন

- **সদর্থক/অস্ত্যর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য :**

১. রমা চুপ করিয়া রহিল। > রমা কথা কহিল না।/ রমা কিছু বলিল না।

২. চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি গন্ডার সাবাড় করে থাকি। > চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি-গণ্ডার সাবাড় যে করি না, এমন নয়।

৩. এরা সব 'ক্ষুদ্র শিল্পী'। > এরা কেউই খুব 'বড়ো শিল্পী' নয়।

৪. কদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে। > কদিন ধরে সমানে বৃষ্টির আব শেষ নেই।

৫. বেণীর মুখ গম্ভীর হইল। > বেণীর মুখ প্রফুল্ল রহিল না।

৬. ওখানেই জায়গা করে নেব। > ওখানেই জায়গা না-করে নিয়ে ছাড়ব না।

৭. তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। > তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল কে না দেখিয়াছ?

৮. গত পনেরো বছর ধরে এই রেওয়াজ চলছিল। > গত পনেরো বছর ধরে এছাড়া অন্য রেওয়াজ ছিল না।

৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। > হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি একদমই পরিচিত ছিলেন না।

১০. লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। > লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও সন্দেহ না-ফুটে উঠে পারল না।

- **নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে সদর্থক/ অস্ত্যর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য :**

১. অবশ্য গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। > অবশ্য গাছের গতি প্রায় অদৃশ্য।

২. ইংলান্ডে গিয়ে আমি চিঠি না-দেওয়া পর্যন্ত ও চিঠির উত্তর দিও না। > ইংলান্ডে গিয়ে আমি চিঠি দিলে তবেই এ চিঠির উত্তর দিও।

৩. আমরা ছোকরার দল, আমাদের তেমন কোনো কাজকর্ম ছিল না। > আমরা ছোকরার দল, আমাদের কাজকর্ম খুব অল্পই ছিল।

৪. তাছাড়া তখন হয়তো এত মোটা ছিলেন না আপনারা। > তাছাড়া তখন হয়তো বেশ রোগা ছিলেন আপনারা।

৫. যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেই বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। > যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেই বন্দী জীবনটা তুলনায় কম যন্ত্রণাদায়ক।

৬. একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের আর অন্য কাজ থাকিব না। > একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের কেবল একটিই কাজ থাকিত।

৭. রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। > রঞ্জন সারাটা দিন বাড়িতেই ছিল।

৮. তোকে অ্যালবাম দিতে হবে না। > তোর অ্যালবাম না দিলেও চলবে।

৯. লোকটা জানলই না। > লোকটার অজানা থাকল।

১০. মৃত্যুর পরে তো আমার কোনো স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে না। > মৃত্যুর আগেই আমার যত স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে।

- **সদর্থক/অস্ত্যর্থক বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য :**

১. রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার গন্ধ লেগে আছে। > রৌদ্রে কি ভিজে বেদনার গন্ধ লেগে নেই?

২. অরণ্য, প্রান্তর, শূন্য তেপান্তর— সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে। > অরণ্য, প্রান্তর, শূন্য তেপান্তর — সব পথে বৃথাই ঘুরিনি কি?

৩. শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। > শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ, নয় কি?

৪. ভোমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে। > ভোমরা কি যেত না গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে?

৫. সমস্ত বাধা নিষেধের বাইরেও আছে অস্তিত্বের অধিকার। > সমস্ত বাধা নিষেধের বাইরেও কি নেই অস্তিত্বের অধিকার?

৬. শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার। > শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার ছাড়া আর কী আছে?

৭. পান-চিবানো ঠোঁটের ফাঁকে এবং প্রশস্ত কপালে একটুখানি যেন বিদ্রুপের ছায়া। > পান-চিবানো ঠোঁটের ফাঁকে এবং প্রশস্ত কপালে একটুখানি বিদ্রুপের ছায়া ছাড়া আর কি?

৮. মণিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে যোগ দিলাম। > মনিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে কি আর যোগ না দিয়ে পারি?

৯. অর্ধেক এশিয়া মাসিডনের বিজয় বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। > অর্ধেক এশিয়া কি মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়নি?

১০. ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে। > ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে পারবি কি বাক্স থেকে?

- **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

১. ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। (না সূচক বাক্যে)

২. বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়তো ওই জীবন তার আর ভালো লাগছিল না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৩. সেদিকটার দরজা বন্ধ। (না-সূচক বাক্যে)

৪. তাঁর হয়েছে বড়ো জ্বালা। (বিস্ময়-সূচক বাক্যে)

৫. বুড়ো চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। (প্রশ্নসূচক বাক্যে)

৬. দুপুরে খাওয়ার সময়টায় এক বেড়াল ছাড়া তার কাছাকাছি আর কেউ থাকে না বড়ো একটা। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৭. তোর অধঃপাত দেখলে আমি কোথায় গিয়ে মুখ লুকোব? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৮. তাঁর কানে যদি এসব কথা যায় তাহলে রক্ষে রাখবে ভেবেছিস? (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৯. ও মানুষের মর্ম তোমরা বুঝবে না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১০. মা বলল, আমরা কি অত জানতুম বাছা! (নির্দেশক বাক্যে)

১১. দোকানে বিক্রিবাটা কেমন হে? (প্রশ্নবাক্যটির প্রকার নির্দেশ করো)

১২. এগিয়ে চলতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)

১৩. মশাল হাতে কালিঝুলি মাখা একটা লোক দাঁড়িয়ে। (না-সূচক বাক্যে)

১৪. আর বলবেন না মশাই। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১৫. বকশিশের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। (না-সূচক বাক্যে)

১৬. বয়স তো বোধহয় সাতাশ-আঠাশ। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

১৭. খুব ভালো বলেছেন। (বিস্ময়বোধক বাক্যে)

১৮. খুব ভোরবেলায় উঠে অনেকটা দৌড়াতে হবে। (অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে)

১৯. আশ্বিন মাসেও আজ ঘাম হচ্ছে। (না-সূচক বাক্যে)

২০. আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনাটা তত মিথ্যে নয়। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)
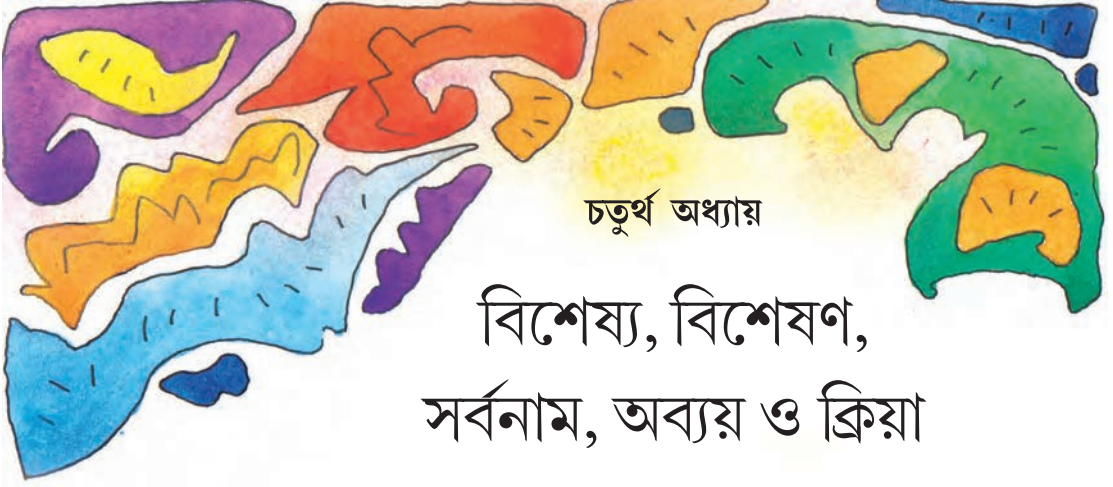
চতুর্থ অধ্যায়

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া

বাক্যের মধ্যে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার প্রতিটিই হলো এক একটি পদ। এই পদ তৈরি হয় শব্দের সঙ্গে শব্দবিভক্তি আর ধাতুবিভক্তি যুক্ত হয়ে। তাহলে পদ হলো শব্দের পরিবর্তিত একটি রূপ, যা দিয়ে আমরা বাক্যগঠন করি এবং মনের ভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করি। যেমন—

জয়ের মাথা ধরেছে।

—এই বাক্যটিতে আমরা তিনটি পদের ব্যবহার লক্ষ করছি। যেগুলি তৈরি হয়েছে এভাবে—

শব্দ +	**শব্দবিভক্তি/ধাতুবিভক্তি**	**= পদ**
জয় +	এর	= জয়ের
মাথা +	শূন্য	= মাথা
ধরা +	ইয়াছে/এছে	= ধরেছে

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত এই পদগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাঁচ ধরনের পদ লক্ষ করি। যেমন—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়।

এবার আমরা একে একে এই পাঁচটি শ্রেণি পদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা ও তা ব্যবহারের বিশিষ্টতাগুলি নিয়ে চর্চা করব।

বিশেষ্য

গান্ধিজি হলেন জাতির জনক।

এই বাক্যে ‘গান্ধিজি’ পদটি দিয়ে একটি বিশেষ নামকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোনো পদের দ্বারা আমরা যদি কোনো কিছুর নাম বোঝাতে চাই তাকেই বলে বিশেষ্য পদ। একে নাম বা নামপদও বলা হয়। যেমন —

গোরু গৃহপালিত পশু।

নজরুল দুই বাংলারই অবিস্মরণীয় কবি।

ভারতের উত্তরে **হিমালয়** পর্বতের অবস্থান।

গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম নদী।

ওপরের চারটি বাক্যের স্থূলাক্ষর পদগুলি হলো বিশেষ্য পদ।

এইভাবে ব্যক্তি, বস্তু, দ্রব্য, স্থান, কাল, পাত্রের নাম বোঝালেই বিশেষ্য পদ হবে।

বিশেষ্য পদকে আবার নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

- **ব্যক্তি/সংজ্ঞাবাচক :** ভারত, দামোদর, কলকাতা, রামায়ণ ইত্যাদি।
- **জাতিবাচক :** পশু, পাখি, মানুষ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি।
- **পদার্থ/বস্তুবাচক :** মাটি, পাথর, লোহা, সোনা, চাল, গম ইত্যাদি।
- **গুণবাচক ও অবস্থাবাচক :** সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, শৈশব, যৌবন ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার দেশের গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত।

ওপরের বাক্য চারটিতে বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে নাম ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে তিনি বা তাঁর শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। এমন ব্যবহারে অর্থের পরিবর্তন ঘটে না, সেইসঙ্গে বাক্যগুলি শ্রুতিমধুর হয়।

যেমন —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার দেশের গৌরব।

তিনি জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁর লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত।

এইভাবে সাধারণত নামের বা বিশেষ্যের (আগে উল্লেখ করা হয়েছে এমন) পরিবর্তে যে পদ আমরা বাক্যে ব্যবহার করি তাকেই বলে সর্বনাম। যেমন— আমি, তুমি, সে, তাকে, ইনি, ওটা ইত্যাদি।

বাংলায় নানাধরনের সর্বনাম-এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যেমন—

- **পুরুষবাচক :** আমি, তুমি, সে ইত্যাদি।
- **সাকল্যবাচক :** সব, সকল, উভয় ইত্যাদি।
- **সাপেক্ষবাচক :** যে, যিনি, যা ইত্যাদি।
- **প্রশ্নসূচক:** কে, কি, কী ইত্যাদি।
- **আত্মবাচক :** নিজ, নিজে, আপনি ইত্যাদি।
- **অন্যাদি :** অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।

- **ব্যতিহারিক :** আপনা-আপনি ইত্যাদি।
- **সামীপ্যবোধক :** এ, এটা, ইনি ইত্যাদি।
- **পরোক্ষবোধক :** ও, ওটা, উনি ইত্যাদি।

বিশেষণ

খোঁপায় বেঁধেছে **হলুদ** গাঁদার ফুল।

ওপরের বাক্যটিতে গাঁদা ফুলটির একটা বিশেষ গুণ উল্লেখিত হয়েছে। গুণটি হলো 'হলুদ'। যা কিনা গাঁদা ফুলকে এক বিশিষ্ট পরিচয় দান করেছে। এইভাবে বাক্যে ব্যবহৃত যেপদ কোনো কিছুকে বিশিষ্ট করে তাকেই বলে বিশেষণ। বিশেষণ শুধু যে বিশেষ্যকেই বিশেষিত করে তা নয়, অন্যান্য অর্থাৎ সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি পদকেও বিশেষিত করে।

বাংলা ভাষায় বহু ধরনের বিশেষণের প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। যাকে আবার মূল চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন—

- **বিশেষ্যের বিশেষণ :** **পাকা** বাড়ি। **পোষা** কুকুর। **অনেক** লোক। **অল্প** চুল। **দু**রাত। **তিন** বেলা। **প্রথম** শ্রেণি। **বিংশ** শতক। **ধবধবে** চাদর। **ঝিরঝিরে** বৃষ্টি।
- **সর্বনামের বিশেষণ :** **সে** কাল। **কী** ঝামেলা। **স্বকীয়** বৈশিষ্ট্য। **মদীয়** বাসভবন।
- **বিশেষণের বিশেষণ :** **খুব** ভালো নাটক। **কনকনে** ঠান্ডা বাতাস।
- **ক্রিয়া বিশেষণ :** **জোরে** হাঁটো। **সুখে** থেকো। **ক্রমাগত** চলছে।

ক্রিয়া

বরুণ ছবি **আঁকছে**।

বাক্যটিতে 'আঁকছে' পদটি দ্বারা একটি কাজ করা বোঝাচ্ছে। এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এও দেখতে পাব যে, এখানে 'বরুণ' সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। এইভাবে বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় সে হলো উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যা বলা হয় তা হলো বিধেয়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য 'বরুণ' হচ্ছে কর্তা আর তার হওয়া বা কোনো কিছু করা যে শব্দ দ্বারা বোঝানো হলো তা হচ্ছে ক্রিয়া। যেহেতু এখানে 'আঁকছে' পদটি দিয়ে 'বরুণ'-এর কোনো কাজ করা বোঝানো হয়েছে তাই এই পদটি হলো ক্রিয়া।

এই ক্রিয়া বাক্যের বিধেয় অংশে থাকে। যেমন—

পাখি **ওড়ে**। সূর্য **ওঠে**। জল **পড়ে**।

বাক্যগুলিতে বিধেয় অংশে থাকা 'ওড়ে', 'ওঠে', 'পড়ে'-এই পদগুলি যথাক্রমে পাখি, সূর্য ও জলের কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে, তাই এরা একএকটি ক্রিয়াপদ।

ধাতুর পরিচয়

ক্রিয়াপদের মূলকে ধাতু বলা হয়। ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়।

কয়েকটি উদাহরণ—

নাচ্ (ধাতু) + ছে (ক্রিয়া বিভক্তি) = নাচছে

কর্ (ধাতু) + বেন (ক্রিয়া বিভক্তি) = করবেন

চল্ (ধাতু) + ই (ক্রিয়া বিভক্তি) = চলি

কর্ (ধাতু) + লে (ক্রিয়া বিভক্তি) = করলে

বল্ (ধাতু) + লাম (ক্রিয়া বিভক্তি) = বললাম

সমাপিকা ক্রিয়া

‘খোকা ঘুমাল
পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কীসে?’

ওপরের কবিতাংশে ‘খোকা **ঘুমাল**’ ‘পাড়া **জুড়াল**’ ‘বর্গি **এল** দেশে’ ‘বুলবুলিতে ধান **খেয়েছে**’ ‘খাজনা **দেব** কীসে’ এই একটি বাক্যে ক্রিয়াপদগুলির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মনের ভার প্রকাশ পাচ্ছে। কোনো কিছু বলার বা শোনার বাকি থাকছে না।

ওপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি সমপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কোনো বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

করছে, বলছে, ঘুমাচ্ছে, চলি, বলি, আছি, হই, হলাম, এসেছি, জানি, গাইলাম, বসি প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

অসমাপিকা ক্রিয়া

সে বাড়ি **এসে**

সালাম মাঠে **গিয়ে**

ওপরের বাক্যাংশে **এসে, গিয়ে** ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ পূর্ণ হচ্ছে না।

এইভাবে যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

খেয়ে, যেয়ে, বলে, মেরে, থামলে, থাকতে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

এ, লে, তে প্রভৃতি বিভক্তি যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

অব্যয়

সুতপা মেধাবী মেয়ে **কিন্তু** ভীষণ অহংকারী।

কামাল পড়তে বসল **এবং** তপন খেলতে গেল।

ওপরের বাক্যদুটি লক্ষ করলে দেখব মোটা শব্দগুলি একটু নতুন ধরনের। দুটি বাক্যের মধ্যে 'কিন্তু', 'এবং',-এই শ্রেণির পদগুলির কোনো অবস্থাতেই রূপের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ বাক্যে মধ্যে এই পদগুলির ব্যবহার সবসময় একই রকম থাকে। এদের কোনো ক্ষম বা ব্যয় নেই বলেই এরা 'অব্যয়' নামে চিহ্নিত। তাই বলা যায়, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও বিভক্তি ভেদে যে পদের কোনোরকম পরিবর্তন হয় না, তাদের অব্যয় বলে।

যেমন : কিংবা, এবং, কেননা, আহা, মতো, তো, নচেৎ, কিন্তু, বরং, সুতরাং ইত্যাদি। অব্যয়কে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— সংযোজক অব্যয়, আবেগসূচক অব্যয় এবং আলংকারিক অব্যয়।

(১) সংযোজক অব্যয়

আমি ভুটান যাব **এবং** তিনদিন থাকব।

মেঘলা **ও** তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।

ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে '**এবং**'। দ্বিতীয় বাক্যে মেঘলা ও তুমি এই দুটি পদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে '**ও**'। এইভাবে **এবং, ও** পদদুটো বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় বলে এদের সংযোজক বলে।

যে পদ একাধিক বাক্য বা পদের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তাদের সংযোজক অব্যয় পদ বলে। সংযোজক হলো — ও, এবং, আর, বা, যদি।

(২) আবেগসূচক অব্যয়

বাঃ, কী চমৎকার তোমার গানের গলা!

ইস্, একটুর জন্য ট্রেনটা ধরতে পারলাম না।

বাঃ, ইস্ প্রভৃতি পদে দিয়ে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তাই বাংলা ভাষায় এদের **আবেগসূচক অব্যয় পদ** বলে।

অব্যয়ের আরো কিছু উদাহরণ—

উহ্ কী ঠান্ডা। **ধেৎ,** লোডশেডিং হয়ে গেল। **শাবাশ,** দারুণ খেলেছ।

(৩) আংলকারিক অব্যয়

যাও **না,** কোনো অসুবিধে নেই।

আগে **তো** এসো, তারপর মেলায় যাবার কথা ভাবব।

ওপরের বাক্যমধ্যে **না, তো**— এই পদগুলি বাক্যের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এ যেন বাড়তি অলংকার। অলংকার যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনই অলংকার বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বাক্যটিকে শ্রুতিমধুর করে।

বলা যায়— **যে সমস্ত অব্যয় বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাদের আংলকারিক অব্যয় পদ বলে।**

প্রশ্নবোধক — কি, কেন, কেমন

১. ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ তোকে নিয়ে আর পারি না। — নিম্নরেখ অংশটি হলো :

(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) অব্যয় (ঘ) ক্রিয়া

১.২ তোমার কথা বলতে বলতেই তুমি চলে এলে। —এই বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি হলো :

(ক) কথা বলতে বলতে (খ) বলতে বলতে (গ) এলে (ঘ) চলে এলে।

১.৩ মূলকে বলে —

(ক) সমাপিকা (খ) অসমাপিকা (গ) ধাতু (ঘ) প্রত্যয়

১.৪ ওর কথা আর তুমি বোলো না। ওকে কেউ পছন্দ করে না। আমি এটা জানি। — এই অংশে সর্বনামের সংখ্যা হলো —

(ক) ছয় (খ) সাত (গ) পাঁচ (ঘ) চার

১.৫ আমি এবং সুভাষ কলকাতায় যাবো। কিন্তু তুমি যে যাবে সেটাও আমার জানা।— এই অংশে অব্যয়ের সংখ্যা হলো

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২. নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ বিশেষ্য পদকে কীভাবে চেনা যায়?

২.২ একই নামকে বারবার ব্যবহার না করে বাক্যে কোন পদটি ব্যবহার করা হয়?

২.৩ কোন পদের দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের গুণ, দোষ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণ বোঝানো হয়ে থাকে?

২.৪ ক্রিয়া কীভাবে তৈরি হয়?

২.৫ তারা গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে। —বাক্যটিতে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করো।

২.৬ আমি লিখি। — বাক্যটিতে ক্রিয়া বিশেষণ যোগ করে লেখো।

২.৭ ‘অব্যয়’ বলতে কী বোঝ?

৩. নীচের বাক্যগুলিতে কোনটি কোন শ্রেণির অব্যয় তা নির্দেশ করো :

৩.১ আমি আর তুমি সেখানে যাবো।

৩.২ বাঃ, চমৎকার বলেছ!

৩.৩ ‘এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।’

৩.৪ শাবাস, এমন কাজ তো তোমাকেই মানায়।

৩.৫ তুমি বা সে সময়মতো আমার কাছে জিনিসটি পৌঁছে দেবে।
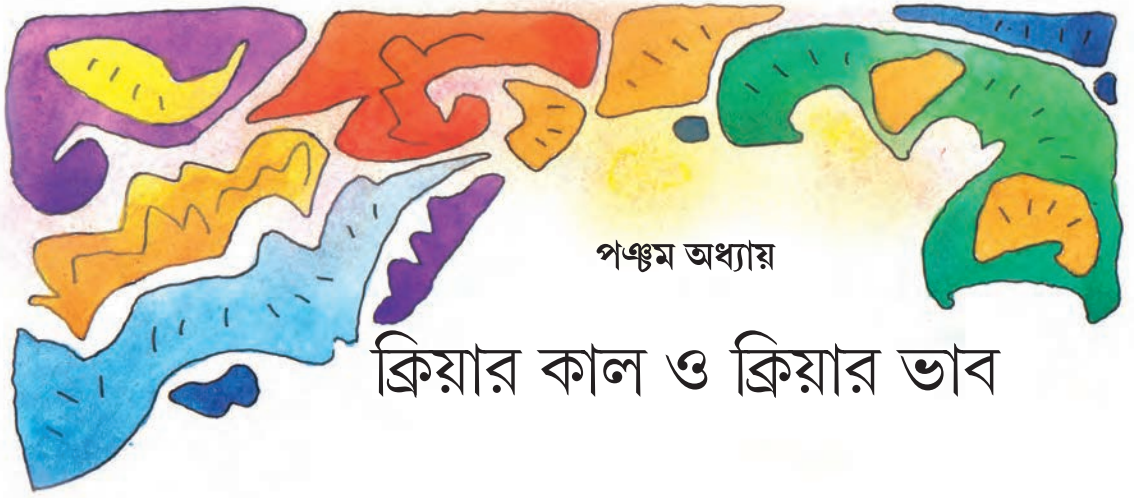
পঞ্চম অধ্যায়

ক্রিয়ার কাল ও ক্রিয়ার ভাব

'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ সময়। অস্তিত্ববান যা কিছু সবই এই সময়ের অধীন। অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ — কাল নিরবধি। কোনও কিছুই সময়ের গ্রাসের বাইরে নয়। বস্তুত সময় সব কিছুকে 'কলন' বা গ্রাস করে বলেই সময়ের আর এক নাম 'কাল'।

এই নিরবচ্ছিন্ন কালকে আমরা সুবিধার্থে তিনভাগে ভাগ করি। যে ঘটনা বা ক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, যার কিছুটা স্মৃতিধার্য আর বাকি পুরোটাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে — তাকে আমরা বলি অতীত। আর যে ঘটনা বা ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, কিন্তু যা অনিবার্যভাবেই ঘটবে, অথবা ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তাকে আমরা বলি ভবিষ্যৎ। বলা বাহুল্য অতীত ও ভবিষ্যৎ — দুই-ই অন্তহীন। আর এই দুই-এর মধ্যে মিলনসংযোগকারী ক্ষণটিকেই বলা হয় বর্তমান। এখন, এই মুহূর্তটিই শুধু বর্তমানকাল। এক মুহূর্ত আগের প্রদীপটি যেমন পর মুহূর্তে আর অভিন্ন নয়, কেননা তেল কমে গেছে, শিখার আকার পরিবর্তিত হয়েছে, সলতেও খানিকটা পুড়ে গেছে, তবু বিভিন্ন ক্ষণে একটিই প্রদীপ দেখছি বলে মনে হয় আমাদের, তেমনই অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে এই অভিযাত্রায় বর্তমান ক্ষণটির অবতারণা। অনাদি অতীতের অজস্র ও জটিল কর্মপ্রবাহের কার্য-কারণ সূত্রে তার প্রস্তাবনা আর ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনায় তার বিলয় তথা রূপান্তর। অর্থাৎ, কালের তিনটি প্রধান ভাগ : (ক) অতীত, (খ) বর্তমান, (গ) ভবিষ্যৎ।

এই কাল তথা সময়ের উপরে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা মানুষের ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই লক্ষ করা গেছে। মানুষ কখনও চেয়েছে অমর হতে। চিরযৌবনের অধিকারী হতে, আবার কখনও চেয়েছে টাইম মেশিন বা সময়যান তৈরি করে সময়ের বিভিন্ন মাত্রায় পরিভ্রমণ করতে। পুরাণ থেকে কল্পবিজ্ঞান — সর্বত্রই কালকে নিয়ে মানুষের চিন্তা ও কল্পনার ব্যাপ্তি আমাদের অভিভূত করে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার মতো সময়কেও বস্তুজগতের একটি মাত্রা হিসেবে বিজ্ঞান নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করে দেবার পরে এই জল্পনা বেড়েছে বই কমেনি। সময়কে পরিমাপেরই বা কত ব্যবস্থা। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি বা পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের পরিভ্রমণের মতো মহাজাগতিক বিষয়ের সঙ্গে তার কারবার। আবার তুলনায় ছোটো এককেরও কত রকমফের।

তার পরিমাপের যন্ত্রেরও কত বিবর্তন। সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, বালুঘড়ি থেকে শুরু করে আজকের ন্যানো সেকেন্ড বা তার চেয়েও ছোটো একক মাপবার ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজিটাল ওয়াচ — ঘড়ির বিবর্তনের ইতিহাসও কিছু কম আকর্ষণীয় নয়।

ভাষা আমাদের চিন্তার বাহন, এমনকি মাধ্যমও। তাই পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই বিভিন্ন কালবাচক নানাশব্দের মতোই বিভিন্নকালে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। ক্রিয়ার ওপরেই কালের প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন কালবাচক বিভক্তি ক্রিয়াগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের বিভিন্ন কালে ব্যবহারের যোগ্যতা প্রদান করে। আবার সূক্ষ্মতার বিচারে একই কালের ক্রিয়ারও বিভিন্ন রূপভেদ দেখা যায়। কালানুক্রম-অনুসারে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ — এই ক্রমেই আলোচনা বিধেয় হলেও বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা প্রথমে বর্তমানকাল ও তার রূপভেদগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এরপরে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ও তাদের রূপভেদগুলি নিয়ে কথা বলার অবসর পাওয়া যাবে।

বর্তমান কাল

যে ক্রিয়া এখন, বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে, তার কালকে বলা হয় বর্তমান কাল। আগেই বলা হয়েছে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগকারী এই বর্তমান। সূক্ষ্মতার বিচারে এরও আবার নানারকম প্রকারভেদ আছে। এই প্রকারভেদ অনুযায়ী বর্তমান কালের পরিসরের মধ্যেই বিভিন্ন রূপের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন :

‘হেথায় মানুষ বসত **করে**।’

‘তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে **পড়ছে**।’

‘তাই এখন পথে এসে **দাঁড়িয়েছে** সড়কের মাঝখানে।’

‘তবে লিস্টি **কর**।’

দৃষ্টান্তগুলিতে ‘করে’, ‘পড়ছে’, ‘দাঁড়িয়েছে’ এবং ‘কর’ — এই ক্রিয়াপদগুলি সবই বর্তমানকালের। কিন্তু তাদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বাক্যের কর্তা পুরুষ বা পক্ষ-অনুসারে ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে পৃথক পৃথক পুরুষ-বাচক বিভক্তি যুক্ত হয়। তার আগে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় কালবাচক প্রত্যয়টি।

ক্রিয়া-সংঘটনকালে সূক্ষ্মতা অনুযায়ী ক্রিয়ার বর্তমান কালকে চারপ্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে : (১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান, (২) ঘটমান বর্তমান, (৩) পুরাঘটিত বর্তমান ও (৪) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা।

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান :

যেখানে ক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবে ঘটে অথবা চিরকাল ধরে ঘটে থাকে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান বলে। সাধারণ বা নিত্য বর্তমানে মূলধাতুর সঙ্গে কোনো কালবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না। উত্তম, মধ্যও ও প্রথম পুরুষে যথাক্রমে ‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’- পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়। মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থে ‘এন’ এবং তুচ্ছার্থে/নৈকট্য বোঝাতে ‘ইস’ যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে ‘কর’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কর্’ + ই = করি, মধ্যমপুরুষে ‘কর্’ + অ = কর, ‘কর্’ + এন = করেন [সম্ভ্রমার্থে], ‘কর্’ + ইস্ = করিস (তুচ্ছার্থে/নৈকট্য বোঝাতে) এবং প্রথম পুরুষে ‘কর্’ + এ =

করে, ‘কর’ + এন = করেন [সম্ভ্রমার্থে] রূপ হয়। যেমন : ‘মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস **কর** না, কারণ আজকাল কেউ **করে** না, কিন্তু আমি **করি**।’

(ক) ঐতিহাসিক বর্তমান : সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবর্তমান কালের ক্রিয়াকে অতীতকালে সংঘটিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় অভিন্নরূপে ব্যবহার করলে তার কালকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলা হয়ে থাকে। যেমন : ‘বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম (ডি.লিট) উপাধিদানে সম্মানিত **করেন**।’

(খ) অতীতকালের অর্থে বর্তমানকালের ক্রিয়ার ব্যবহার : অনেক সময় অতীতকাল বোঝাতে বর্তমান কালের ক্রিয়ার তির্যক ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমনি :

‘আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ **দিই** তখনো অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ **হয়**নি।’

(২) ঘটমান বর্তমান :

যে ক্রিয়ার কাজ এখনও সংঘটিত হচ্ছে, তার কালকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান। ঘটমান বর্তমানে মূলধাতুর সঙ্গে ‘ইতে’ অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়, ‘আছ্’ ধাতু এবং পুরুষ বাচক ক্রিয়াটি বিভক্তি [অর্থাৎ ‘ই’, ‘অ’, এবং ‘এ’] যোগ করে ক্রিয়া রূপ গঠিত হয়। উত্তম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইতে + ‘আছ্’ ধাতু + ই = করিতেছি, মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইতে + ‘আছ্’ ধাতু + অ [এন, এস] = করিতেছ [করিতেছেন, করিতেছিস] এবং প্রথম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইতে + ‘আছ’ ধাতু + এ [এন] = করিতেছে [করিতেছেন] হয়। চলিত ভাষায় এদের রূপ হবে : করছি, করছ [করছেন, করছিস], করছে [করছেন]। যেমন :

‘তিনি কলকাতায় **আসছেন** সেতার বাজাতে।’

‘ঠিক এই সময় আমি ভেসে **চলেছি** বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে।’

‘মানুষই ফাঁদ **পাতছে**।’

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান :

যে ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়ে গেলেও তার ফল এখনও বর্তমান, তার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান। পুরাঘটিত বর্তমানে মূল ধাতুর সঙ্গে ‘ইয়া’ অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়, ‘আছ্’ ধাতু এবং বিভিন্ন পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি [‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’] যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপের গঠন হয়ে থাকে। যেমন, উত্তম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইয়া + ‘আছ্’ ধাতু + ই = করিয়াছি, মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইয়া + ‘আছ্’ + অ [এন, ইস্] = করিয়াছি [করিয়াছেন, করিয়াছিস] এবং প্রথম পুরুষে ‘কর্’ ধাতু + ইয়া + ‘আছ্’ ধাতু + এ (এন) = করিয়াছে (করিয়াছেন) রূপ হয়। চলিতভাষায় এদের রূপ হবে যথাক্রমে : করেছি, করেছ [করেছেন, করেছিস], করেছে [করেছেন]। যেমন :

‘দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে **উঠেছে** ফুল
ঢেলে **দিয়েছে** বুকের সুগন্ধ।
উড়ে **এসেছে** রং-বেরঙের পাখি
শুরু **করেছে** কলকণ্ঠের কাকলি।’

(৪) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :

বর্তমান কালে প্রার্থনা, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়। এ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানব ‘ক্রিয়ার ভাব’ অংশে।

অতীত কাল

যে ক্রিয়া ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়ে গেছে এবং যার রেশ বর্তমানে আর অনুভূত হয় না, তার কালকে অতীত কাল বলা হয়।যেমন :

'সকলেই অবাক হইয়া **তাকাইত**, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র **করিতেন** না।'

ক্রিয়া-সংঘটনকালের সূক্ষ্মতার বিচারে অতীত কালকেও চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা — (১) সাধারণ বা নিত্য অতীত, (২) ঘটমান অতীত, (৩) পুরাঘটিত অতীত ও (৪) নিত্যবৃত্ত অতীত। স্বাভাবিকভাবেই এই কাল-বিভাগ অনুসারে অতীত কালের ক্রিয়ারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

(১) সাধারণ বা নিত্য অতীত :

যে ক্রিয়া অতীতে নিষ্পন্ন হয়ে গেছে এবং যার ফলও বর্তমান নেই, তার কালকে সাধারণ অতীত বা নিত্য অতীত বলা হয়। সাধারণ বা নিত্য অতীতে মূল ধাতুর সঙ্গে অতীত কাল-বাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াবিভক্তি (আম, এ, অ, এন, ই) যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-রূপের গঠন করে।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + 'ইল্' + আম = করিলাম, মধ্যমপুরুষে 'কর্' + ইল্ + এ [এন] = করিলে [করিলেন] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইল্ + অ [এন] = করিল [করিলেন] রূপ হয়ে থাকে। চলিত ভাষায় এদের রূপ যথাক্রমে হবে করলাম, করলুম, করলেম, করলে, করলি, করল এবং করলেন। যেমন :

'রিকশাগাড়ির সবটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা **হয়েছিল** কী করে?

'কেন ওরকম কথা **বললি**?'

'রবিকাকাকে **বললুম**, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্য।'

(২) ঘটমান অতীত :

যে ক্রিয়াটি অতীত কালে সংঘটিত হচ্ছিল, তার কালকে ঘটমান অতীত বলা হয়। ঘটমান অতীতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইবে' প্রত্যয়। 'আছ্' ধাতু অতীতকালবাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, এন, ই] যুক্ত হয়ে ক্রিয়া রূপ গঠিত হয়।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইতে + 'আছ্' + ইল + আম = করিতেছিলাম মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে 'কর' + ইবে + 'আছ্' + ইল্ + এ [এন, ই] = করিতেছিলে [করিতেছিলেন, করিতেছিলি] এবং প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে 'কর্' + ইতে + 'আছ্' + ইল + অ [এন] = করিতেছিল [করিতেছিলেন] রূপ হয়ে থাকে।

চলিতভাষায় এই রূপগুলি হয় যথাক্রমে করছিলাম, করছিলুম, করছিলেন, করিতেছিলেম, করছিলে, করছিলি, করছিলিস, করছিল এবং করছিলেন। যেমন :

'ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা **করছিলেন**'।

'একটা চাপা বেদনা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে **ফেলছিল**।'

'ওই পথ দিয়ে জরুরি দরকারে **যাচ্ছিলাম** ট্যাক্সি করে।'

(৩) পুরাঘটিত অতীত :

অতীতকালে সংঘটিত হয়েছিল, এমন ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত অতীত বলা হয়। পুরাঘটিত অতীতে মূলধাতুর সঙ্গে 'ইয়া' প্রত্যয়, 'আছ্' ধাতু, অতীতকালবাচক 'ইল' প্রত্যয় এবং সর্বশেষে পুরুষানুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি [এ , অ , এন ,ই] যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া-রূপের গঠন করে।

'কর ' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'আছ্' + ইল্ + আম = করিয়াছিলাম, মধ্যমপুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'আছ্' + ইল্ + এ [এন, ই] = করিয়াছিলে [করিয়াছিলেন, করিয়াছিলি] এবং প্রথমপুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'আছ্' + ইল্ + অ [এন] = করিয়াছিল [করিয়াছিলেন] রূপ হয়ে থাকে।

চলিতভাষায় এই রূপগুলি যথাক্রমে করছিলাম, করেছিলি, করেছিলিস, করেছিল এবং করেছিলেন হয়। যেমন :

'মুর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান **করিয়াছিলেন**।'

'ওইরকম খেয়ে খেয়েই শরীরখানা ঠিক **রেখেছিলেন** ভদ্রলোক।'

(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত :

অতীতে প্রায়ই ঘটত — এই অর্থে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলা হয়। নিত্যবৃত্ত অতীতে মূলধাতুর সঙ্গে অতীত কালবাচক 'ইত' প্রত্যয় এবং পুরুষ অনুসারে [আম, এ, অ, এন] ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ গঠন করে। 'কর' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইত + আম = করিতাম, মধ্যম পুরুষে 'কর্' + ইত + এ [এন্ ইস্] = করিতে (করিতেন, করিতিস) এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইত + অ [এন] = করিত [করিতেন] রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

চলিতভাষায় এই রূপগুলি হয় যথাক্রমে : করতাম, করতুম, করতেম, করতে, করতেন, করতিস, করত এবং করতেন। যেমন :

'একটুখানি শ্যামল-ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শতশত দেখা **দিত** মনের শিষের ইশারাতে

'ঘুঘুডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়া ভরে শ্রান্তজনে হাতছানিতে **ডাকত** কাছে

'হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে **দিতেম**।'

ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়াটি এখনও সংঘটিত হয়নি, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলা হয়, যেমন — 'নৌকা না পাই সাঁতারেই পার **হমু** বুড়িগঙ্গা।'

ভবিষ্যৎ কালকেও চারভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা — (১) সাধারণ ভবিষ্যৎ, ঘটমান ভবিষ্যৎ, (৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ এবং (৪) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

স্বাভাবিক ভাবেই এই কালবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়ে থাকে।

(১) সাধারণ ভবিষ্যৎ :

যে ক্রিয়া এখনও সংঘটিত হয়নি, কিন্তু পরে নিশ্চিতভাবেই হবে তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ

বলা হয়। সাধারণ ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইত্' প্রত্যয় এবং পুরুষানুযায়ী ক্রিয়া বিভক্তি [অ, এ, এন, ই] যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ গঠিত করে।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইন্ + অ = করিব, মধ্যমপুরুষে 'কর্' + ইন্ + এ [ই, এন] = করিবে [করিবি, করিবেন] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইন্ + এ [এন] = করিবে [করিবেন] — এই ক্রিয়ারুপগুলি হয়ে থাকে। চলিত বাংলায় এদের রূপগুলি হয় যথাক্রমে : করব, করবে, করবি, করবেন। যেমন :

'ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে **বলিব**।'

'ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট **চাইবে**।'

'**বলবি**, তুই বাঁধ পাহাড়া দিচ্ছিলি'

(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ :

যে ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে থাকবে, তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলা হয়। ঘটমান ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইতে' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং তারপর 'আছ্' ['থাক্' আদেশ] ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইব্' প্রত্যয় ৪এবং পুরুষ অনুসারে [অ, এ, এন, ই] ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ গঠন করে, লক্ষণীয় 'আছ' এখানে 'থাক্' - আকার ধারণ করে থাকে।

'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইতে + 'থাক্' + ইব্ + অ = করিতে থাকিব, মধ্যমপুরুষে 'কর' + ইতে + 'থাক্' + ইব্ + এ [ই, এন] = করিতে থাকিবে [করিতে থাকিবি, করিতে থাকিবেন] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইতে + 'থাক্' + ইব্ + এ [এন] = করিতে থাকিবে [করিতে থাকিবেন] — রূপগুলি তৈরি হয়ে থাকে।

চলিত বাংলা রূপগুলি হয়, যথাক্রমে : করতে থাকব, করতে থাকবে, করতে থাকবি, করতে থাকবেন। যেমন :

তুমি যখন পরীক্ষার পড়া **পড়তে থাকবে**, তখন আমি পৃথিবীর পথে **হাঁটতে থাকব**।

সে তখনও নেচে নেচে গান গাইতে **থাকবে**।

যতই বাধা থাক, তুমি কি **এগোতে থাকবে না**?

(৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা পুরাঘটিত সম্ভাব্য (সম্ভাব্য অতীত) :

ভবিষ্যৎকালে কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে থাকবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো ক্রিয়া সম্ভবত সংঘটিত হতে পারবে — এই অর্থে ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বলে। মজার কথা, পুরাঘটিত ভবিষ্যতের ক্রিয়াটি অতীতের ভাবও কিছুটা বহন করে, আর বহন করে সম্ভাব্যতা ও সংশয়ের ভাব। তাই একে সম্ভাব্য অতীতও বলা হয়ে থাকে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইয়া' প্রত্যয়, তারপরে 'আছ' [ও 'থাক' আদেশ] ধাতু এবং ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইব্' প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি [অ, এ, এন, ই] যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপ তৈরি করে।

'কর' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'থাক্' + ইব্ + অ = করিয়া থাকিব, মধ্যম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'থাক্' + ইব্ + এ [ই, এন] করিয়া থাকিবে করিয়া থাকিবি, করিয়া থাকিবেন এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' + ইয়া + 'থাক্' + ইব + এ [এন] = করিয়া থাকিবে (করিয়া থাকিবেন) — রূপগুলি হয়।

চলিত বাংলায় রূপগুলি যথাক্রমে, করে থাকব, করে থাকবে, করে থাকবি, করে থাকবেন হয়ে থাকে। যেমন :

কেউ জানবে না, কোনদিন সে হয়তো **জিতে বসে থাকবে**।

তুমি যখন আসিবে তখনও তিনি **না খাইয়া থাকিবেন**।

তুমি এক গোল দিতে না দিতেই আমি দশ গোল **দিয়ে বসে থাকব**।

(৪) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা :

প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদির কার্য-সংঘটন কাল ভবিষ্যতে বোঝালে যে অনুজ্ঞা হয় তাকে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা বলে। এ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানব 'ক্রিয়ার ভাব' অংশে।

মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল

'রূপ' ও অর্থ অনুসারে ক্রিয়ার কালকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা — ১. মৌলিক কাল বা সরল কাল এবং ২. যৌগিক কাল।

(১) মৌলিক কাল বা সরল কাল :

যেখানে ধাতুর সঙ্গে অন্য কোনো ধাতু যুক্ত না হয়ে কেবল ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তার কালকে বলা হয় মৌলিক কাল বা সরল কাল।

সাধারণ/নিত্য বর্তমান, সাধারণ/নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ — এই চারটি মৌলিক বা সরল কালের উদাহরণ।

(২) মিশ্রকাল বা যৌগিককাল :

মূল ধাতুর সঙ্গে অন্য কোনো ধাতু ও ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তার কালকে মিশ্রকাল বা যৌগিক কাল বলা হয়ে থাকে। বাংলায় যৌগিক কাল-রূপ দশটি যথাক্রমে : ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত এবং পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত।

ক্রিয়ার ভাব

বাক্যে ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার রীতিকে বলা হয় ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার। ক্রিয়ার ভাব বা প্রকারকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) নির্দেশক ভাব, (২) অনুজ্ঞা ভাব ও (৩) আপেক্ষিক ভাব।

১. **নির্দেশক ভাব :** যখন কোনো ক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়া বোঝায়, এমনকি কোনো প্রশ্ন বা বিস্ময়ের দ্বারা কাজটি নির্দেশিত হয়, তখন তাকে নির্দেশক বা নির্ধারক বা অবধারক ভাব বলা হয়। যেমন :

‘শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান।’

‘সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ!

‘তোমাদের সব কাজ কি কবিতায় হবে?’

২. **অনুজ্ঞা ভাব :** কিছু করার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আশীর্বাদ, কামনা বা প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝানোর সময় ক্রিয়ার যে বিশেষ রীতি প্রযুক্ত হয়, তাকে অনুজ্ঞা ভাব বলে। যেমন :

‘সভার কাজ শুরু করে দাও সভানেত্রী।’ (আদেশ)

‘ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে কতটুকুন তফাৎ হলো।’ (উপদেশ)

‘ভুল করে যদি ভুল লিখে ফিলি, নম্বর তবু দিও।’ (প্রার্থনা)

‘দেখিস, আমাদের ভুলিসনে।’ (অনুরোধ)

‘কাল’-এর দিক থেকে অনুজ্ঞাকে দুভাগে দেখা হয়— বর্তমান কালের অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

(ক) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :

বর্তমান কালে প্রার্থনা, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়। এটি কেবলমাত্র মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমান কালের অনুজ্ঞার সচরাচর মূল ধাতুর সঙ্গে ‘উন্’, ‘ইস্’, ‘উক’ — এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়ে থাকে। ‘কর’ ধাতুর বর্তমানকালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ + ও = করো, সম্ভ্রমার্থে ‘কর্’ + উন = করুন এবং তুচ্ছার্থে/নৈকট্য বোঝাবে ‘কর্’ + ইস্ = করিস রূপ হয়। আর প্রথম পুরুষে ‘কর্’ + উক = করুক এবং সম্ভমার্থে ‘কর্’ + উন = করুন রূপ হয়ে থাকে। যেমন :

‘না পাবো তো চিনা বাক্যে ‘চুপ করিয়া ডুবে **যেয়ো**।’

‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আগে অহবা **দাও** প্রাণ।’

‘আপনি সত্বর প্রস্থান **করুন**।’

(খ) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা :

প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদির কার্য-সংঘটন কাল ভবিষ্যতে বোঝালে যে অনুজ্ঞা হয় তাকে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা বলে। এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালবাচক ‘ইব’ প্রত্যয় এবং মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ‘এ’ অথবা ‘ইও’ ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। উত্তমপুরুষে অনুজ্ঞা হয় না।

‘কর’ ধাতুর ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে ‘কর্’ + ইব্ + এ = করিবে অথবা কর্ + ইও = করিও হয়। তুচ্ছার্থে ‘ইস্’ এবং সম্ভ্রমার্থে ‘হবেন’ ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, ‘কর্’ + ইস্ = করিস এবং ‘কর্’ + হবেন = করিবেন। যেমন :

যেও না, রজনি তুমি লয়ে তারাদলে।

কখনো মিথ্যা কথা **বলবে না**।

পিতামাতাকে ভক্তি **করিবে**।

তবে মনে রাখা উচিত, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘অনুজ্ঞা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কোনও কাল-রূপ নহে, ক্রিয়ার বিশিষ্ট এক ভাব।’

৩. আপেক্ষিক ভাব :

কোনো মিশ্র বা জটিল বাক্যে যদি একটি বাক্যের অর্থ অন্য একটি বাক্যের অপেক্ষায় থাকে তবে তা যে বাক্যটির অর্থের অপেক্ষায় থাকে, তার ক্রিয়াভাবকে আপেক্ষিকভাব বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব বলা হয়। যেমন :

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না **আসে** তবে একলা চলোরে'

'অকপটে মানুষ যদি মানুষকে **ভালোবাসে**, তবে তাহা বৃথা যায় না।'

'তুমি যদি বদলে দিতে **না পারো** তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে হবে। '

ক্রিয়া বিভক্তি

কাল ও পুরুষানুসারে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি বলে। যেমন : 'কর্' [মূলধাতু] + 'ইত্' + এন = করিতেন। এখানে 'ইত্' কালবাচক প্রত্যয় এবং 'এন্' পুরুষবাচক বিভক্তি, 'ইত'-এর মতো 'ইল্' বা 'ইব্' প্রভৃতি অন্যান্য কালবাচক প্রত্যয়। বাংলায় কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হয়। সংস্কৃতে ধাতু বিশেষ এবং বচন বিশেষের জন্য কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। বাংলায় কিন্তু একই প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন, একই 'ইত' প্রত্যয় এবং 'এন' বিভক্তি যোগে 'কর্' ধাতু থেকে 'করিতেন', 'যা' ধাতু থেকে 'যাইতেন', 'লিখ্' ধাতু থেকে 'লিখিতেন' প্রভৃতি ক্রিয়া তৈরি হয়ে থাকে। স্মরণীয় যে, যৌগিক ক্রিয়ারূপ গঠনে 'আছ্' ধাতুর যোগ অপরিহার্য। যেমন : 'কর্' + ইয়া + আছ্ + ই = করিতেছি, ভবিষ্যতে 'আছ্' ধাতুর 'থাক্' —আদেশ হয়ে থাকে।

এখানে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ দেওয়া হলো :

- **বর্তমান কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ/নিত্যবর্তমান	ই	অ, ইস্, এন	এ, এন
ঘটমান বর্তমান	ইতেছি (ছি)	ইতেছ(ছ), ইতেছিস (ছিস), ইতেছেন (ছেন)	ইতেছে (ছে). ইতেছেন (ছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	ইয়াছি (এছি)	ইয়াছ (এছ) ইয়াছিস (এছিস)	ইয়াছে (এছে) ইয়াছেন (এছেন)
বর্তমানের অনুজ্ঞা	×	অ, উন	উক, উন

● **অতীত কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ/ নিত্য অতীত	ইলাম [লাম, লুম, লেম]	ইলে (লে) ইলি (লি)	ইল (ল) ইলেন (লেন)
নিত্যবৃত্ত অতীত	ইতাম [তাম, তুম, তেম]	ইতে ইতিস্ (তিস)	ইত (ত) ইতেন (তেন)
ঘটমান অতীত	ইতেছিলাম [ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম]	ইতেছিলে (ছিলে) ইতিছিলি (ছিলি) ইতেছিলেন (ছিলেন)	ইতেছিল (ছিল) ইতেছিলেন (ছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	ইয়াছিলাম [এছিলাম, এছিলুম, এছিলেম]	ইয়েছিলে (এছিলে) ইয়াছিলি (এছিলি) ইয়াছিলেন (এছিলেন)	ইয়াছিল (এছিল) ইয়াছিলেন (এছিলেন)

● **ভবিষ্যৎ কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইব (ব)	ইবে (বে) ইবি (বি) ইবেন (বেন)	ইবে (বে) ইবেন (বেন)
ঘটমান ভবিষ্যৎ	ইতে থাকিব (তে থাকব)	ইতে থাকিবে (তে থাকবে) ইতে থাকিবি (তে থাকবি) ইতে থাকিবেন (তে থাকবেন)	ইতে থাকিবে (তে থাকবে) ইতেথাকিবেন (তেথাকবেন)
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	ইয়া থাকিব (এ থাকব)	ইয়া থাকিবে (এ থাকবে) ইয়া থাকিবি (এ থাকবি) ইয়া থাকিবেন (এ থাকবেন)	ইয়া থাকিবে (এ থাকবে) ইয়া থাকিবেন (এ থাকবেন)
ভবিষ্যতের অনুজ্ঞা	×	ইবে (বে) ইবেন ইও (ও) ইবি (বি) ইস্ (ইস)	ইবে (বে) ইবেন (বেন)

ধাতুরূপ : 'কর্' ধাতু

● **বর্তমান কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ/নিত্য বর্তমান	করি	কর করিস করেন	করে করেন
ঘটমান বর্তমান	করিতেছি (করছি)	করিতেছ (করছ) করিতেছিস (করছিস) করিতেছেন (করেছেন)	করিতেছে (করছে) করিতেছেন (করছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছি (করেছি)	করিয়াছ (করেছ) করিয়াছিস (করেছিস) করিয়াছেন (করেছেন)	করিয়াছে (করেছে) করেতেছেন (করেছেন)
বর্তমানকালের অনুজ্ঞা	×	কর কর করুন	করুক করুন

● **অতীত কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ/নিত্য অতীত	করিলাম (করলাম, করলুম, করলেম)	করিলে (করলে) করিলি (করলি) করিলেন (করলেন)	করিল (করল) করিলেন (করলেন)
নিত্যবৃত্ত অতীত	করিতাম (করতাম, করতুম, করতেন)	করিতে (করতে) করিতিস (করতিস) করতেন (করতেন)	করিত (করত) করিতেন (করতেন)
ঘটমান অতীত	করিতেছিলাম (করছিলাম, করছিলুম, করছিলেম)	করিতেছিলে (করছিলে) করিতেছিলে (করছিলি) করিতেছিলেন (করছিলেন)	করিতেছিল (করছিল) করিতেছিলেন (করতেন)
পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিলাম (করেছিলাম)	করিয়াছিলে (করেছিলে) করিয়াছিলি (করেছিলি) করিয়াছিলেন (করেছিলেন)	করিয়াছিল (করেছিল) করিয়াছিলেন (করেছিলেন)

● **ভবিষ্যৎ কাল**

প্রকার	উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিব (করব)	করিবে (করবে) করিবি (করবি) করিবেন (করবেন)	করিবে (করবে) করিবেন (করবেন)
ঘটমান ভবিষ্যৎ	করিতে থাকিব (করতে থাকব)	করিতে থাকিবে (করতে থাকবে) করিতে থাকিবি (করতে থাকবি) করিতে থাকিবেন (করতে থাকবেন)	করিতে থাকিবে (করতে থাকবে) করিতে থাকিবেন (করতে থাকবেন)
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	করিয়াছি (করেছি)	করিয়াছ (করেছ) করিয়াছিস (করেছিস) করিয়াছেন (করেছেন)	করিয়াছে (করেছে) করেতেছেন (করেছেন)
ভবিষ্যতের অনুজ্ঞা	×	করিবে (করবে) করিও (করো) করিবি (করবি) করিস (করিস) | করিবেন (করবেন)	করিবে (করবে) করিবেন (করবেন)

---

১. ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ কালকে আমরা প্রধানতযে কভাগে ভাগ করতে পারি—
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

১.২ যে ক্রিয়া এখন সংঘটিত হচ্ছে তাকে বলা হয়—
(ক) নিত্য বর্তমান (খ) ঘটমান বর্তমান (গ) পুরাঘটিত বর্তমান
(ঘ) ঘটমান অতীত

১.৩ আমি তো এসে গেছি। — এই বাক্যের ক্রিয়ার কালটি হলো :
(ক) অতীত কাল (খ) পুরাঘটিত অতীত
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) ঘটমান বর্তমান

১.৪ ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিদানে সম্মানিত করেন।'
—এই বাক্যের ক্রিয়ার কালটি হলো :
(ক) নিত্য বর্তমান (খ) ঘটমান বর্তমান (গ) পুরাঘটিত বর্তমান
(ঘ) সাধারণ অতীত

১.৫ আমি যখন চেঁচাতে থাকব, তুই এসে আমাকে সমলানোর অভিনয় করতে থাকবি। — এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া দুটির কাল হলো :

(ক) সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ ভবিষ্যৎ (খ) ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান ভবিষ্যৎ
(গ) দুটিই ঘটমান বর্তমান (ঘ) দুটিই ঘটমান ভবিষ্যৎ

১.৬ কাল ও পুরুষানুসারে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে বলে—

(ক) ক্রিয়াবিভক্তি (খ) ক্রিয়ার কাল (গ) ক্রিয়ার ভাব (ঘ) ক্রিয়ার ধাতু।

১.৭ 'আমি যদি ক্যাপ্টেন হই, তাহলে চারজন স্ট্রাইকার নিয়ে খেলব।'— এটি ক্রিয়ার কোন ভাবের উদাহরণ?

(ক) নির্দেশক (খ) বর্তমান অনুজ্ঞা (গ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (ঘ) আপেক্ষিক ভাব

১.৮ 'আগামী তিনদিনের মধ্যে কাজটি দাও।' — এটি ক্রিয়ার কোন ভাবের উদাহরণ —

(ক) নির্দেশক (খ) বর্তমান অনুজ্ঞা (গ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (ঘ) আপেক্ষিক ভাব

১.৯ 'সত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ!' — এই বাক্যটি সম্পর্কে নীচের কোন বক্তব্যটি ঠিক —

(ক) এটি বর্তমান কাল ও বর্তমান অনুজ্ঞার উদাহরণ
(খ) এটি বর্তমান কাল ও নির্দেশক ভাবের উদাহরণ
(গ) এটি অতীত কাল ও অতীত অনুজ্ঞার উদাহরণ
(ঘ) এটি অতীত কাল ও নির্দেশক ভাবের উদাহরণ

১.১০ নীচের কোনটি মৌলিক কালের উদাহরণ —

(ক) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (গ) নিত্যবৃত্ত অতীত
(খ) পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত (ঘ) নিত্যবৃত্ত বর্তমান

২. নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ কালকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়?

২.২ বর্তমান কাল বলতে কী বোঝায় একটি উদাহরণসহ লেখো।

২.৩ পুরাঘটিত বর্তমান ও ঘটমান বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২.৪ ক্রিয়ার ভাব বলতে কী বোঝায় একটি উদাহরণসহ লেখো।

২.৫ ক্রিয়াবিভক্তি কাকে বলে?

২.৬ বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদটি কীভাবে গঠিত হয়?

২.৭ আপেক্ষিক ভাবের একটি উদাহরণ দাও।

২.৮ নিত্যবৃত্ত বলতে কী বোঝায়? যেকোনো একটি কালের সাপেক্ষে উদাহরণ দাও।

২.৯ ঘটমান অতীতের উত্তমপুরুষ যদি হয় 'ছিলাম' তাহলে ঘটমান ভবিষ্যতের মধ্যমপুরুষ কী হবে?

২.১০ অতীত অর্থে বর্তমানকালের ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাস
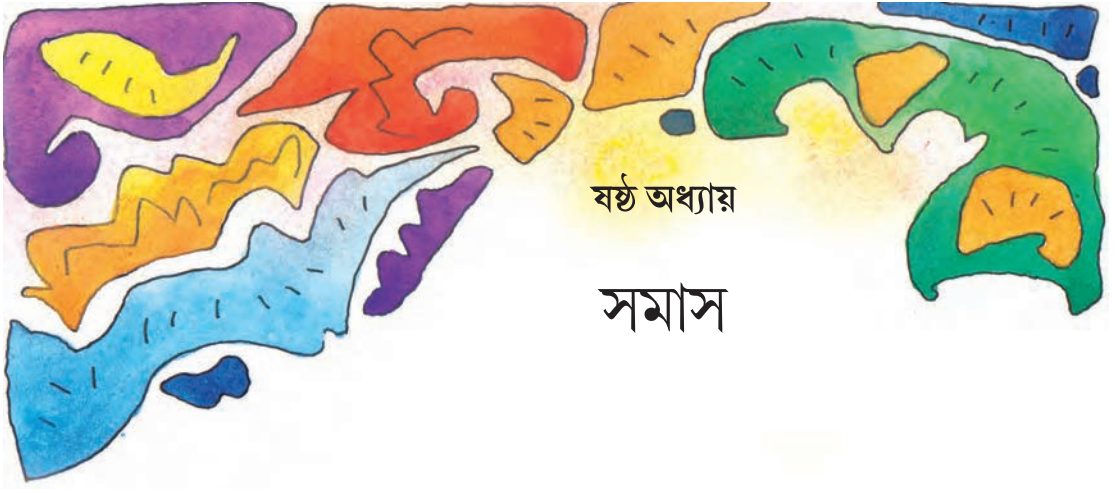
অর্থসম্বন্ধযুক্ত দুই বা দুয়ের বেশি পদের মিলিত হওয়ার নাম সমাস।

'সমাস' শব্দটির অর্থ হলো 'সংক্ষিপ্ত করা' (সম্ — √অস্ + অ (ঘঞ্) = সমাস)। সমাস-এর আলোচনায় যে পরিভাষা গুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন :

- **সমাস পদ :** **যে কটি পদ মিলে সমাস হয় তার প্রতিটিকে বলা হয় সমস্যমান পদ।** 'হাতঘড়ি' এই সমাসবন্ধ পদে হাতে পরিবার ঘড়ি এই তিনটি সমস্যমান পদ।
- **ব্যাসবাক্য :** **যে বাক্য বা ব্যাকাংশ দিয়ে সমস্যমান পদগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে বলে ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য** (ব্যাস, বিগ্রহ = বিশ্লেষণ) এখানে, হাতে পরিবার ঘড়ি = ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।
- **সমস্তপদ :** **সমাস করে যে নতুন পদটি হয়, তাকে বলে সমস্ত পদ।** হাতঘড়ি = সমস্ত পদ
- **পূর্বপদ :** **সমস্যমান পদগুলোর প্রথমটির নাম পূর্বপদ।** রাজার = পূর্বপদ।
- **পরপদ :** **সমস্যমান পদগুলোর শেষেরটির বা পরের পদটির নাম পরপদ** বা **উত্তরপদ।** পরিবার ঘড়ি = পরপদ বা উত্তরপদ। (উত্তর = পরবর্তী)।

অর্থাৎ সন্ধি ও সমাস—উভয়ের কাজই শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তকরণ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। সেগুলি হল —

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি	সমাস
১. সন্ধিতে সন্নিহিত ধ্বনিসমূহের মিলন ঘটে।	১. সমাসে অর্থসম্বন্ধযুক্ত একাধিক পদের একপদে পরিণতি ঘটে।
২. সন্ধির ধ্বনিগত মিলন লক্ষ করা যায়।	২. সমাসের পদগত মিলন লক্ষ করা যায়।
৩. সন্ধিতে প্রতিটি পদের অর্থ অক্ষুন্ন থাকে।	৩. একমাত্র দ্বন্দ্ব সমাসে প্রতিটি পদের অর্থ অক্ষুন্ন থাকে। তৎপুরুষ ও কর্মধারয়

সন্ধি	সমাস
	সমাসে পরপদের অর্থপাধান্য থাকে। অব্যয়ীভাবে পূর্বপদের অর্থপ্রাধান্য এবং বহুব্রীহিতে ইঙ্গিত রয়েছে এমন তৃতীয় একটি পদের অর্থপ্রাধান্য।
৪. সন্ধিতে বিভক্তি লোপের বিষয়টিই নেই।	৪. সমাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তি চিহ্ন লোপ পায়।
৫. সন্ধিতে শব্দের অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।	৫. সমাসে শব্দের অর্থের অনেক রকমের পরিবর্তন হয়।
৬. সন্ধিতে পদগুলির ক্রম অক্ষুন্ন থাকে।	৬. সমাসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদদুটি স্থান পরিবর্তন করে।
৭. সন্ধিতে কখনই একটি শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ আসে না।	৭. সমাসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ আসে।

সমাসের শ্রেণিবিভাগ

সংস্কৃত ব্যাকরণে অর্থপ্রাধান্য অনুসারে সমাস প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত : ১. অব্যয়ীভাব, ২. তৎপুরুষ, ৩. দ্বন্দ্ব ও ৪. বহুব্রীহি।

কর্মধারয়, দ্বিগু ও তৎপুরুষ সমাসে পরপদ বা উত্তর পদের অর্থ প্রধান, দ্বন্দ্ব সমাসে উভয়পদেরই অর্থ প্রধান, বহুব্রীহিতে সমস্যমান পদদুটি ব্যতীত অন্য একটি পদের অর্থ প্রধান। তবে উত্তরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় বলে কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসকে সংস্কৃত ব্যাকরণে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে কর্মধারয় ও দ্বিগুকে পৃথক সমাস হিসেবেই ধরা হয়।

বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস এই আট প্রকার : ১. কর্মধারয়, ২. তৎপুরুষ, ৩. দ্বন্দ্ব, ৪. বহুব্রীহি, ৫. দ্বিগু, ৬. নিত্য সমাস, ৭. অলোপ সমাস ও ৮. বাক্যাশ্রয়ী সমাস।

১. কর্মধারয় সমাস

যে সমাসের পূর্বপদ সাধারণত পরপদের বিশেষণ হিসেবে থাকে এবং সমাসবদ্ধ পদে পরপদের অর্থই প্রধান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগগুলি নীচে আলোচনা করা হলো :

১.১ সাধারণ কর্মধারয়

• বিশেষণ—বিশেষ্য •

পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র
উড়ো যে জাহাজ = উড়োজাহাজ
মেজো যে মামা = মেজোমামা
নীল যে আকাশ = নীলাকাশ

একইভাবে : খাসমহল, সুপুরুষ, বিকচকেতকী, শ্বেতচন্দন, হেডমাস্টার, পীতাম্বর, ধ্রুবতারা, মিষ্টান্ন, শুচিবস্ত্র, নবযৌবন, কালফাঁদ, রক্তচন্দন, কড়াপাক, হাফমোজা, কাঁচকলা, গন্ডগ্রাম।

• বিশেষ্য—বিশেষণ (পূর্বনিপাত) •

ভাজা যে পটল = পটলভাজা
সেদ্ধ যে ডিম = সেদ্ধডিম
কতক যে দিন = দিনকতক
বাটা যে হলুদ = হলুদবাটা

• বিশেষণ—বিশেষণ •

যা অল্প তাই মধুর = অল্পমধুর
যা স্নিগ্ধ তাই উজ্জ্বল = স্নিগ্ধোজ্জ্বল
যে চালাক সেই চতুর = চালাকচতুর
যিনি গণ্য তিনিই মান্য = গণ্যমান্য

• বিশেষ্য—বিশেষ্য •

যা গঙ্গা তাই নদী = গঙ্গানদী
যা হিমালয় তাই পর্বত = হিমালয় পর্বত
যিনি গুরু তিনিই দেব = গুরুদেব
যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ = চিদানন্দ

একইভাবে : গিন্নিমা, গোলাপফুল, পণ্ডিতমশাই, মাতৃদেবী, ভারতভূমি।

• আগে—পরে •

আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা
পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত
আগে কাটা পরে বাছা = কাটাবাছা

১.২ উপমিত কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদে উপমেয় (যাকে তুলনা করা হচ্ছে) ও উত্তর পদে উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে) থাকে এবং যেখানে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না, তাকে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস বলে। এখানে পূর্বপদ ও উত্তরপদ দুটিই বিশেষ্য; কিন্তু উত্তরপদটিতে বিশেষণের ভাব থাকে। যেমন:

পুরুষ সিংহের মতো = পুরুষসিংহ
কর পল্লবের মতো = করপল্লব
চরণ পদ্মের মতো = চরণপদ্ম
কথা অমৃতের তুল্য = কথামৃত

• পূর্বপদে উপমান ও উত্তরপদে উপমেয় •

চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ
অগ্নির মতো দৃষ্টি = অগ্নিদৃষ্টি
সিংহের মতো শিশু = সিংহশিশু
কদমের মতো ছাঁট = কদমছাঁট

একইভাবে : চরণকমল, পলাশলোচন, চন্দ্রানন, চরিতামৃত, বাহুলতা

১.৩ উপমান কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ উপমান ও উত্তরপদে সাধারণ ধর্ম থাকে তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। এখানে পূর্বপদটি বিশেষ্য ও উত্তরপদটি বিশেষণ। যেমন:

কাজলের মতো কালো = কাজলকালো
হস্তীর মতো মুর্খ = হস্তীমুর্খ
বিড়ালের মতো তপস্বী = বিড়ালতপস্বী
বকের মতো ধার্মিক = বকধার্মিক

১.৪ রূপক কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদে উপমেয় এবং উত্তরপদে উপমান এবং এদের মধ্যে অভেদ বা অভিন্নতা

কল্পনা করা হয়, তাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলে। যেমন:

মন রূপ মাঝি = মনমাঝি দুঃখ রূপ অনল = দুঃখানল

জীবন রূপ নদ = জীবননদ প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি

১.৫ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদ লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন:

শহিদ স্মরণে পালিত দিবস = শহিদদিবস নীতি বিষয়ক শাস্ত্র = নীতিশাস্ত্র

একইভাবে : বরফজল, রাষ্ট্রনীতি, জয়োল্লাস, মানিব্যাগ, অনুষ্ঠানপত্র।

উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় এবং রূপক কর্মধারয় — এই তিন রকমের কর্মধারয় সমাসকে উপমার সাহায্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় বলে এদের **উপমামূলক কর্মধারয়** সমাস বলতে পারি।

২. তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসের পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে পূর্বপদের কর্ম করণ অপাদান ইত্যাদি কারকের বিভক্তিচিহ্ন বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ লোপ পায়। এই সমাসের ব্যাসবাক্য গঠন করতে পূর্বপদে অর্থ অনুযায়ী কর্ম করণ অপাদান অধিকরণ ইত্যাদি কারকের বিভক্তিচিহ্ন বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ যোগ করতে হয়। তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ ও তার উদাহরণগুলি নীচে দেওয়া হলো :

২.১ কর্ম তৎপুরুষ

কাপড়কে কাচা = কাপড়কাচা চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত

হস্তকে গত = হস্তগত কলাকে বেচা = কলাবেচা

একইভাবে : লুচিভাজা, তরীবাওয়া, গাঁটকাটা, লোকদেখানো, দেশোদ্ধার।

২.২ করণ তৎপুরুষ

রোগ দ্বারা আক্রান্ত = রোগাক্রান্ত দা দিয়ে কাটা = দাকাটা

ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা আশার দ্বারা হত = আশাহত

শ্রী দ্বারা হীন = শ্রীহীন রক্ত দ্বারা শূন্য = রক্তশূন্য

একইভাবে : ট্রেনভ্রমণ, কলেছাঁটা, বজ্রাহত, রবীন্দ্ররচিত, শোকার্ত, অশ্রুভরা, গুরুদত্ত, তৃষ্ণার্ত, আশাহত,বিদ্যাহীন, জ্ঞানশূন্য, যুক্তিহীন, জনশূন্য।

২.৩ নিমিত্ত তৎপুরুষ

তপের নিমিত্ত বন = তপোবন উন্নতির জন্য বিধান = উন্নতিবিধান

তীর্থের জন্য যাত্রা = তীর্থযাত্রা ভাণ্ডারের নিমিত্ত ঘর = ভাণ্ডারঘর

২.৪ অপাদান তৎপুরুষ

মৃত্যু হইতে ভয় = মৃত্যুভয় দুগ্ধ থেকে জাত = দুগ্ধজাত

জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ রোগ থেকে মুক্ত = রোগমুক্ত

একইভাবে : ঐশ্বর্যভ্রষ্ট, জন্মস্বাধীন, ঋণমুক্ত, স্কুলফেরতা, খাপখোলা, চাকভাঙা, বন্যাত্রাণ।

২.৫ সম্বন্ধ তৎপুরুষ

র, এর : রাজার পুত্র = রাজপুত্র মৃগের শিশু = মৃগশিশু

মাতার মুক্তি = মাতৃমুক্তি জগতের জন = জগজ্জন

পূর্বনিপাত : রোগের রাজা = রাজরোগ তরুর রাজা = রাজতরু

মিস্ত্রিদের রাজা = রাজমিস্ত্রি হংসের রাজা = রাজহংস

একইভাবে : সিপাহিবিদ্রোহ, শ্বশুরবাড়ি, মউচাক, গঙ্গামাটি, ব্রাহ্মসমাজ, রাজভৃত্য, রাজধানী, সুধাকর, ঘনঘটা, আঁখিলোর, গুণীসমাজ।

২.৬ অধিকরণ তৎপুরুষ

এ, য়, তে : গৃহে বাস = গৃহবাস জলে মগ্ন = জলমগ্ন

বস্তায় বন্দি = বস্তাবন্দি গলায় ধাক্কা = গলাধাক্কা

বাটাতে ভরা = বাটাভরা মাথাতে ব্যথা = মাথাব্যথা

একইভাবে : বিলেতবাস, গঙ্গাস্নান, অরণ্যজাত, কর্মব্যস্ত, আকাশভ্রমণ, মনমরা।

২.৭ না-তৎপুরুষ

নয় মঞ্জুর = না মঞ্জুর নয় আচার = অনাচার

নাই খোঁজ = নিখোঁজ নয় সাধ্য = অসাধ্য

একইভাবে : গররাজি, অনাবাদি, অনাসৃষ্টি, নগণ্য, নিখরচা, বিজোড়, অনাবৃষ্টি।

২.৮ উপপদ তৎপুরুষ

গৃহে স্থ (আছেন) যিনি = গৃহস্থ খনিতে জন্মে যা = খনিজ

মধু পান করে যে = মধুপ পদ দ্বারা পান করে যে = পাদপ

একইভাবে : অগ্রজ, দেশজ, প্রকৃতিস্থ, দূরবস্থ, কণ্টস্থ, মোক্ষদা, বরদা, জলদ, বনস্থ,

অগ্রে গমণ করে যে = অগ্রগামী ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি = জিতেন্দ্রিয়

জ্ঞান হারিয়েছে যে = জ্ঞানহারা শত্রুকে হত্যা করে যে = শত্রুঘ্ন

একইভাবে : মিথ্যাবাদী, দ্বাররক্ষী, শৃঙ্গধর, মণিকার, কুম্ভকার, রণজিৎ, ঘরছাড়া, অরিন্দম।

● একদেশী তৎপুরুষ ●

(দেশ = অংশ)

দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া অহ্নের অপরভাগ = অপরাহ্ণ

একইভাবে : মধ্যাহ্ন, পূর্বাহ্ণ, মাঝনদী।

২.৯ ব্যাপ্তি তৎপুরুষ

বাংলায় ‘ব্যাপ্তি’ বোঝাতে কোনো আলাদা বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। তাই বাংলায় এ ধরনের সমাসকে **ব্যাপ্তি তৎপুরুষ** সমাস বলা হয়। যেমন —

চিরকাল ব্যাপিয়া যুবা = চিরযুবা
জীবন ব্যাপিয়া আনন্দ = জীবনানন্দ
চিরকাল ব্যাপিয়া হরিৎ = চিরহরিৎ
বিশ্ব ব্যাপিয়া যুদ্ধ = বিশ্বযুদ্ধ

একইভাবে : চিরশত্রু, চিরসন্ত, ক্ষীণস্থায়ী, চিরসুখী।

(ঞ) ক্রিয়াবিশ্লেষণ তৎপুরুষ

অর্ধভাবে মৃত = অর্ধমৃত
নিম ভাবে রাজি = নিমরাজি
আধ ভাবে পাকা = আধপাকা
অর্ধভাবে স্ফুট = অর্ধস্ফুট

(ট) উপসর্গ তৎপুরুষ

যে সমাসের পূর্বপদে **এ, বি, উৎ** প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, তাকে উপসর্গ তৎপুরুষ সমাস বলে।

দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ
আচার্যর সদৃশ = উপাচার্য
বিধিকে অতিক্রম না করে = যথাবিধি
নদীর সাদৃশ = উপনদী

একইভাবে : যথার্থ, যথেচ্ছ, ঠিকমতো, রীতিমতো, যথালাভ, বিখ্যাত, উপকণ্ঠ, যথেষ্ট

ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
ভাতের অভাব = হাভাত
আমিষের অভাব = নিরামিষ
মিলের অভাব = গরমিল
বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন
সুরের অভাব = বেসুর

একইভাবে : বেগতিক, বেকসুর, হাঘরে, বেইজ্জত, না-মিষ্টি, না-টক।

ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ, অনুক্ষণ
বছর বছর = ফি-বছর
অঙ্গে অঙ্গে = প্রত্যঙ্গ
কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ
হাঁটু পর্যন্ত = হাঁটুনাগাল
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত

একইভাবে : আমৃত্যু, আমরণ, আজীবন, আশৈশব, আকৈশোর, আযৌবন, আজানু, আদ্যোপান্ত, আমূল, গলানাগাল, আবালবৃদ্ধবনিতা, যাবজ্জীবন, আসমুদ্র, আকর্ণ, আবাল্য।

পক্ষের বিপরীত = প্রতিপক্ষ
রূপের যোগ্য = অনুরূপ
গুণের যোগ্য = অনুগুণ
ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ
তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ
রণনের পশ্চাৎ = অনুরণন

৩. দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ‘যুক্ত’। এই সমাসে ‘ও’ এবং ‘আর’ সংযোজক পদ দিয়ে পূর্বপদ ও উত্তর পদ যুক্ত হয়। সমাসবদ্ধ পদে, সংযোজক লুপ্ত হয় এই সমাসে উভয়পদের অর্থই প্রাধান্য পায়।

দেব ও দ্বিজ = দেবদ্বিজ
গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য
দিন ও রাত = দিনরাত
বর ও বধূ = বরবধূ
অন্ন ও বস্ত্র = অন্নবস্ত্র
মাতা ও পিতা = মাতাপিতা

৩.১ দুটি বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব

ধর্ম ও কর্ম = ধর্মকর্ম ফুল ও ফল = ফুলফল

ভাই ও বোন = ভাইবোন কুশ ও লব = কুশীলব

স্বর্গ ও মর্ত্য = স্বর্গমর্ত্য জন্ম ও মৃত্যু = জন্মমৃত্যু

একইভাবে : বইখাতা, চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, বন্ধুবান্ধব, যাতায়াত, রক্তমাংস, জামাকাপড়, স্কুলকলেজ, চোখকান, হাতপা, পথঘাট, ছেলেমেয়ে, বউঝি, কইমাগুর, শালসেগুন, সুখশান্তি, নদনদী, দাসদাসী, পিতাপুত্র, মাসিপিসি, দরজা-জানালা, ধুতিচাদর, গোরুবাছুর, মুড়িমুড়কি, পড়াশোনা, নাচগান, বলা-কওয়া, আসা-যাওয়া, ধোয়ামোছা, দেখাশোনা, কায়দাকানুন, যুগযুগান্তর, নিশিদিন, ধানদূর্বা, অশনবসন।

৩.২ দুই সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব

তুমি ও আমি = তুমি-আমি আমার ও তোমার = আমার-তোমার

একইভাবে : একে-ওকে, যাকে-তাকে, একে-তাকে, যে-সে, যার-তার, এটা-সেটা, ইনি-উনি,

৩.৩ দুই বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব

ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ সাদা ও কালো = সাদাকালো

ধনী ও দরিদ্র = ধনীদরিদ্র হিত ও অহিত = হিতাহিত

একইভাবে : ন্যায়-অন্যায়, সহজসরল, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ছোটোবড়ো, উচ্চনীচ, উঁচুনীচু, নীললোহিত, হতাহত, কাঁচাপাকা, চেনা-অচেনা, লঘুগুরু, টকঝাল, ইতরভদ্র, কাটাছেঁড়া, আঁকাবাঁকা, বাঁকাট্যারা, নাদুসনুদুস, গোলমাল, সত্যমিথ্যা, ঠান্ডাগরম, নরমে গরমে, লালনীল, সরুমোটা।

৩.৪ দুই ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব

হেসে ও খেলে = হেসেখেলে হেসে ও কেঁদে = হেসেকেঁদে

নেচে ও গেয়ে = নেচেগেয়ে রেখে ও ঢেকে = রেখেঢেকে

একইভাবে : হারজিত, পড়িমরি, বলে-কয়ে, শুয়েবসে, চেয়েচিন্তে, দেখেশুনে, দিয়েথুয়ে, কেঁদে ককিয়ে, হেঁটে-চলে, জেনেশুনে, চলাফেরা, নাচ-গাও, দেখ-শোন।

৩.৫ সমার্থক দ্বন্দ্ব

শাক ও সবজি = শাকসবজি অন্য ও অন্য = অন্যান্য

একইভাবে : মাথামুন্ডু, ছাইভস্ম, ছাইপাঁশ, ছেলেছোকরা, লোকজন, হাটবাজার, লজ্জাশরম, ঘরবাড়ি, খালবিল, নদীনালা, বনজঙ্গল, চিঠিপত্র, কাজকর্ম, ডাক্তারবদ্যি, জনমানব, গা-গতর, ঠাট্টা-মশকরা, মায়ামমতা, যাগযজ্ঞ, দয়ামায়া, মামলামোকদ্দমা, ভয়ডর, চালাক-চতুর।

৩.৬ বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব

সুর ও অসুর = সুরাসুর পাপ ও পুণ্য = পাপপুণ্য

একইভাবে : দেনাপাওনা, কাঁচাপাকা, অহোরাত্র, জন্মমৃত্যু, মিঠেকড়া, স্বর্গনরক, দিনরাত, সকাল-সন্ধ্যা, জোয়ারভাটা, চোরডাকাত, চোরপুলিশ, আসলনকল, আকাশপাতাল, দেওরননদ, স্বামীস্ত্রী, বরবধূ, জলস্থল, হাসিকান্না, ক্রয়বিক্রয়, কেনাবেচা, জয়পরাজয়।

৩.৭ একশেষ দ্বন্দ্ব

আমি, তুমি ও সে = আমরা　　　　　　তুমি ও সে = তোমরা

৩.৮ বহুপদী দ্বন্দ্ব

রাম ও লক্ষ্মণ ও ভরত ও শত্রুঘ্ন = রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন

রূপ ও রস ও গন্ধ ও স্পর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ

একইভাবে : শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, পাইক-পেয়াদা-সেপাই-সান্ত্রী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-বৌদ্ধ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা।

৪. বহুব্রীহি সমাস

যে দুটি পদের সমাস হয়, সমাসবদ্ধ পদে তাদের কোনোটিকে না বুঝিয়ে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে বহুব্রীহি সমাস হয়।

বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি

এখানে 'বীণা' বা 'পাণি' (হাত) না বুঝিয়ে 'বীণাপাণি' অর্থে দেবী সরস্বতীকে বোঝানো হয়েছে। যে দুটি পদের সমাস হবে সেই দুটি পদের একই বিভক্তি হলে, **সমানাধিকরণ** [সমান + অধিকরণ (=বিভক্তি) = সমানাধিকরণ] বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। এক্ষেত্রে পূর্বপদটি বিশেষণ ও পরপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন:

বহু ব্রীহি (ধান) যার = বহুব্রীহি　　　　　নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

সমান অর্থ যাদের = সমার্থক　　　　　হত ভাগ্য যার = হতভাগা

অল্প বয়স যার = অল্পবয়স　　　　　স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা

একইভাবে : পীতাম্বর, শ্যামাঙ্গী, মুখপোড়া, স্বল্পায়ু, মধ্যবয়সি, কৃতবিদ্য, একরোখা, দিগম্বর, এলাকেশী, একচোখা, মা-মরা, পালতোলা, হীরেবসানো।

যে দুটি পদের সমাস হবে সেই দুটি পদের বিভক্তি আলাদা বা বিভিন্ন হলে, তাকে ব্যধিকরণ (বি = বিভাগ) + অধিকরণ (= বিভক্তি) বলা হয়। এতে দুটি পদই বিশেষ্য এবং যে- কোনো একটি পদে 'এ' বিভক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন:

নীল কণ্ঠে যার = নীলকণ্ঠ　　　　　পাতায় বাহার যার = পাতাবাহার

শূল পাণিতে যার = শূলপাণি　　　　　শশ অঙ্কে যার = শশাঙ্ক

পদ্মে আসন যার (স্ত্রী) = পদ্মাসনা　　　　　ধর্মে মতি যার = ধর্মমতি

একইভাবে : চন্দ্রচূড়, বীণাপাণি, ঊর্ণনাভ, পাপবুদ্ধি, হিরণ্যগর্ভ, অন্যমনস্ক, পিনাকপাণি, বজ্রপাণি, গোঁফখেঁজুরে।

বর্তমানে বহুব্রীহি সমাসকে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা হয়েছে :

৪.১ মধ্যপদলোপী বা উপমাত্মক বহুব্রীহি (এক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যে ব্যাখ্যামূলক পদলুপ্ত হয় এবং; উপমা বোঝানো হয়ে থাকে) —

চুল চিরলে যতটা সূক্ষ্ম হয় ততটা সূক্ষ্ম যা = চুলচেরা

ডাকাতের বুকের মতো বুক যার = ডাকাবুকো

মৃগের নয়নের মতো নয়ন যে নারীর = মৃগনয়না
চন্দ্রের মতো বদন যে নারীর = চন্দ্রবদনা
চন্দ্রের মতো মুখ যে নারীর = চন্দ্রমুখী

একইভাবে : এণাক্ষী, বিড়ালচোখা, সোনামুখী, প্যাঁচামুখো, পটলচেরা, কপোতাক্ষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কুম্ভকর্ণ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, উঁচকপালি, প্রথিতযশা।

৪.২ **ব্যতিহার বহুব্রীহির** ক্ষেত্রে (একজাতীয় কাজের পারস্পরিকতা বোঝাতে একই বিশেষ্য পদের দ্বিত্বের ব্যবহার হয়ে থাকে):

পরস্পর গলায় গলায় যে ভাব = গলাগলি
পরস্পর হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি
পরস্পর কোলে টেনে যে আলিঙ্গন = কোলাকুলি
পরস্পর কেশ আকর্ষণ করে যে কলহ = কেশাকেশি
পরস্পর হেসে হেসে যে আলাপ = হাসাহাসি
পরস্পর লাঠিতে লাঠিতে যে কলহ = লাঠালাঠি

একইভাবে : চুলোচুলি, নখানখি, হানাহানি, চটাচটি, টানাটানি, মারামারি, রক্তারক্তি, তর্কাতর্কি, ঘুষোঘুসি, খুনোখুনি, দলাদলি।

৪.৩ **সহার্থক বহুব্রীহি :** (পূর্বপদটি সহ-অর্থযুক্ত; স = সহ)

সমান পতি যার = সপত্নী
ছন্দের সহিত বর্তমান = স্বচ্ছন্দ
স্ত্রীর সহিত বর্তমান = সস্ত্রীক
বিনয়ের সহিত বর্তমান = সবিনয়
উৎসাহের সহিত বর্তমান = সোৎসাহ
লজ্জার সহিত বর্তমান = সলজ্জ

একইভাবে : সজোর, সপুত্র, সাদর, সশব্দ, সকরুণ, সজল, সশঙ্ক, সকৌতুক, সগোত্র, সতীর্থ, সলাজ, সহোদর, সার্থক।

৪.৪ **না- বহুব্রীহি :** (পূর্বপদ নঞ্‌র্থক)

নেই আদি যার = অনাদি
নেই দয়া যার = নির্দয়
নেই অন্ত যার = অনন্ত
নেই ভেজাল যাতে = নির্ভেজাল
নেই বোধ যার = অবোধ
নেই শোক যার = অশোক

একইভাবে : নির্জলা, নিখোঁজ, অসাড়, নিঃসাড়, নিঃসীম, অসীম, বেহুঁশ, বেহেড, বেইমান, বেপাত্তা, বেশরম, বেয়াদব, অনাথ, অবোধ, নির্লজ্জ, নির্ভুল, নির্লোভ, নিরপরাধ, অভ্রান্ত, বিশৃঙ্খলা, অপয়া, অনিমেষ, অকূল, নিরুপায়, নীরব, নির্ধন, নির্বাক, নিখুঁত।

৪.৫ **সংখ্যা বহুব্রীহি :** (পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও উত্তরপদ বিশেষ্য)

দশ আনন যার= দশানন
ত্রি শঙ্কু (দোষ) যার = ত্রিশঙ্কু
চতুঃ (চার) পদ যার= চতুষ্পদ
দ্বি (দু-দিকে) অপ্ যার= দ্বীপ
পঞ্চ আনন যার= পঞ্চানন
চতুঃ (যার) মুখ যার= চতুর্মুখ

একইভাবে : একবয়সি, পাঁচহাতি, দোনলা, দোচালা, আটচালা, একপেশে, একরোখা, একগুঁয়ে, তেপায়া, সমবয়সি, দোতলা, তেতালা।

৫. দ্বিগু সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং উত্তরপদ বিশেষ্য এবং সমাসবব্ধ পদে সমাহার বোঝায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

এখানে উত্তরপদের অর্থই প্রধান। দ্বিগু সমাস দুই প্রকার : **তদ্ধিতার্থক** ও **সমাহার।**

৫.১তদ্ধিতার্থক দ্বিগু

দ্বি গো-র বিনিময়ে কেনা = দ্বিগু ; বাংলায় অনুরূপ শব্দ : তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি। এদের **তদ্ধিতার্থক দ্বিগু** বলে।

৫.২ সমাহার দ্বিগু

নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন
ত্রি ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন
পাঁচ মাথার সমাহার = পাঁচমাথা
পাঁচ ফোড়নের সমাহার = পাঁচফোড়ন
চৌ (চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা
সপ্ত ঋষির সমাহার = সপ্তর্ষি

একইভাবে : সপ্তাহ, দোতারা, সাতখুন, সাতসমুদ্র, তেরোনদী, ত্রিবেণী, পঞ্চবার্ষিক, ষড়রিপু, পঞ্চনদ, চতুষ্পদ, বারোহাত, তেরাত্তির, ষোড়শোপচার, সপ্তসিন্ধু।

• সমাহার দ্বিগু সমাসে কোথাও কোথাও পরপদে 'আ' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যেমন— শতাব্দী, পঞ্চমী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, শতবার্ষিকী, ত্রিফলা, তেপায়া।

৬. নিত্যসমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই সমাসবব্ধ থাকে, তাকে নিত্যসমাস বলে। তাই এর কোনো ব্যাসবাক্য হয় না। এতে স্বপদ অর্থাৎ সমাসের নিজের পদ ব্যবহৃত হয় না বলে এর অন্য নাম **'অ-স্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস'**। নিত্যসমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয় ; **ব্যাসবাক্যহীন যে-কোনো সমাসকেই নিত্যসমাস বলা যায়।** এই সমাসের ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হলে অন্য পদের প্রয়োজন হয়।

অন্য দেশ = দেশান্তর
কেবল কণিকা = কণিকামাত্র
অন্য মত = মতান্তর
কেবল জল = জলমাত্র
অন্য যুগ = যুগান্তর
কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র

একইভাবে : দেখামাত্র, তন্মাত্র, ইন্দুনিভ, বজ্রসন্নিভ, হস্তান্তর, স্থানান্তর, ধর্মান্তর, শূলীশম্ভুনিভ, কাঁচকলা, কালসাপ, ভাবান্তর, ভিক্ষামাত্র, নামমাত্র, প্রকারান্তর, কালান্তর, জন্মান্তর।

৭. অলোপ সমাস

সমাসবব্ধ পদে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে তা যখন সমাসবব্ধ পদেই থেকে যায়—তাকে অলোপ (অলোপ = লোপ না পাওয়া) সমাস বলে।

তাই অলোপ সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। যে সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে সেই সমাসের অন্তর্গত **অলোপ সমাস** বলা হয়।

৭.১ অলোপ দ্বন্দ্ব :

ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে

একইভাবে : দেশে-বিদেশ, হাতেকলমে, জলেকাদায়, আগেপিছে, মায়েঝিয়ে, হাতেপায়ে, পথেঘাটে, চোখেমুখে, বুকেপিঠে, দুধেভাতে, বনেবাদাড়ে।

৭.২ অলোপ করণ তৎপুরুষ :

তেল দ্বারা ভাজা = তেলেভাজা   তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন = তমসাচ্ছন্ন

একইভাবে : ঘিয়েভাজা, হাতেকাটা, কলেছাঁটা, মেশিনে বোনা, হাতে আঁকা, রোদে পোড়া, ছিপেগাঁথা, নাকে কান্না, তাসের ঘর, মাটির মানুষ, কাঠের সিঁড়ি, চোখে দেখা, মেঘেঢাকা।

৭.৩ অলোপ নিমিত্ত তৎপুরুষ :

মুড়ির জন্য চাল = মুড়ির চাল   পেটের জন্য খোরাক = পেটের খোরাক

একইভাবে : চায়ের কাপ, পাতার ঘর, খেলার মাঠ, ভাতের হাঁড়ি, পেটের ভাত, জামার কাপড়।

৭.৪ অলোপ অপাদান তৎপুরুষ :

চোখের জল = চোখের জল   সারৎ (সার থেকে) সার = সারাৎসার

একইভাবে : ঘানির তেল, দোকান থেকে আনা, বাজার থেকে কেনা, আকাশ থেকে পড়া, বিদেশ থেকে আনা।

৭.৫ অলোপ সম্বন্ধ তৎপুরুষ :

ভ্রাতুঃ (ভ্রাতুঃ = ভ্রাতার) পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র   মামার বাড়ি = মামাবাড়ি

পাখির আলয় = পাখিরালয়   বাচঃ (বাক্যের) পতি = বাচস্পতি

একইভাবে : অনুরোধের আসর, ঘরের ছেলে, পরের ছেলে, পরের ধন, ভাগের মা, রাজার মেয়ে, তুষের আগুন, হাতির খোরাক।

৭.৬ অলোপ অধিকরণ তৎপুরুষ : ছাঁচে ঢালা, অঙ্কে কাঁচা, দিনে ডাকাতি, এঁচোড়ে পাকা, অরণ্য রোদন, গোড়ায় গলদ, বাইরে সরল, দুধে আলতা, জলে ডোবা, যুধিষ্ঠির।

৭.৭ অলোপ উপপদ তৎপুরুষ :

খ-এ (বা, তে) চরে যে = খেচর   কলেজে পড়ে যে = কলেজপড়া

জালে পড়েছে যা = জালেপড়া   অন্তে বাস করে যে = অন্তেবাসী

সরসিতে (সরোবরে) জন্মে যা = সরসিজ   রোদে পুড়ছে যা, যে = রোদপোড়া

একইভাবে : জালেপড়া, মনসিজ, গায়েপড়া।

৭.৮ অলোপ বহুব্রীহি :

গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ   ছাতা মাথায় যার, যিনি = ছাতামাথায়

একইভাবে : হাতেখড়ি, লাঠিহাতে, মুখেভাত, পাগড়িমাথা, গলায়মালা, মুখেমধু।

৮. বাক্যাশ্রয়ী সমাস

বাক্য বা বাক্যাংশ যখন সমাসবদ্ধ পদ রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বাক্যাশ্রয়ী সমাস বলে। যেমন —বসে-আঁকো প্রতিযোগিতা, সব পেয়েছির দেশ, নবজলধরপটল সংযোগ, কোণছেঁড়া মলাটওয়ালা, বেশ-একটু রোগা গোছের, দশের ইচ্ছা-বোঝাই করা জীবনখানা, সবুজবাঁচাও কমিটি।

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ অর্থের দিক থেকে সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদকে অথবা একটি উপসর্গ ও একটি পদকে একপদে পরিণত করার নাম
(ক) সন্ধি (খ) কারক (গ) সমাস (ঘ) বাচ্য।

১.২ যেসব পদের সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয়
(ক) সমস্তপদ (খ) সমস্যমান পদ (গ) নামপদ (ঘ) উত্তরপদ

১.৩ সন্ধির দ্বারা গঠিত সমাসবদ্ধ পদের একটি উদাহরণ হলো —
(ক) ছাতামাথায় (খ) খেচর (গ) গ্রামান্তর (ঘ) শীতোষ্ণ

১.৪ প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থ যে সমাসে প্রধানভাবে বোঝায় তাকে বলা হয়
(ক) দ্বিগুসমাস (খ) দ্বন্দ্বসমাস (গ) কর্মধারয় সমাস (ঘ) তৎপুরুষ সমাস।

১.৫ যে সমাসের ব্যাসবাক্যে পূর্বপদের সঙ্গে কারক বা অ-কারক বিভক্তি বা বিভক্তিসহ অনুসর্গ থাকে, কিন্তু সমাসবদ্ধ পদে সেই বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে বলা হয়—
(ক) কর্মধারয় সমাস (খ) তৎপুরুষ সমাস (গ) বহুব্রীহি সমাস (ঘ) বাক্যাশ্রয়ী সমাস।

১.৬ 'শূন্য' বিভক্তিযুক্ত দুটি বিশেষ্য বা দুটি বিশেষণ পদ দিয়ে অথবা 'শূন্য' বিভক্তিযুক্ত একটি বিশেষ্যপদ ও একটি বিশেষণ পদের সহযোগে যে সমাসের সমস্তপদ তৈরি হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে বলা হয়
(ক) কর্মধারয় সমাস (খ) অলোপ সমাস (গ) বহুব্রীহি সমাস (ঘ) দ্বন্দ্ব সমাস

১.৭ দ্বিগু সমাসে পূর্বপদটি
(ক) একটি বাক্যাংশ, যা বিশেষ্য বা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
(খ) সংখ্যা বিশেষণ
(গ) সাধারণ বিশেষ্য
(ঘ) অব্যয়।

১.৮ দ্বি (দুই) গো (গোরু)-এর বিনিময়ে ক্রীত — এটি হলো
(ক) সমাহার দ্বিগুর উদাহরণ
(খ) তদ্ধিতার্থক দ্বিগুর উদাহরণ
(গ) অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ
(ঘ) নিত্য সমাসের উদাহরণ

১.৯ নিত্য সমাসে
(ক) সমস্যমান পদগুলি সমাসবদ্ধ হওয়ার পরেও পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না।
(খ) ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা ব্যাসবাক্য করতে হলে সমার্থক অন্য পদের প্রয়োজন হয়।
(গ) একটি বাক্যাংশকে বিশেষ্য বা বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

(ঘ) পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্য হয় এবং উভয় পদে একই বিভক্তি (শূন্য বিভক্তি) থাকে।

১.১০ রোদে যা পোড়া > রোদেপোড়া। — এটি হলো

(ক) অলোপ তৎপুরুষের উদাহরণ

(খ) অলোপ দ্বন্দ্বের উদাহরণ

(গ) অলোপ বহুব্রীহির উদাহরণ

(ঘ) অলোপ উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ সন্ধি ও সমাসের একটি পার্থক্য লেখো।

২.২ ভাষার কোন প্রক্রিয়াকে ব্যাকরণে 'সমাস' বলা হয়?

২.৩ 'সমাস' শব্দটির সাধারণ অর্থ লেখো।

২.৪ নীচের প্রতিক্ষেত্রে সংজ্ঞা নির্দেশ করো :

২.৪.১ সমস্তপদ ২.৪.২ সমস্যমান পদ ২.৪.৩ ব্যাসবাক্য ২.৪.৪ পূর্বপদ ২.৪.৫ উত্তরপদ

২.৫ 'দ্বিগু' শব্দের আক্ষরিক অর্থটি কী?

২.৬ উপমিত কর্মধারয় এবং উপমান কর্মধারায় সমাসের একটি পার্থক্য লেখো।

২.৭ রূপক কর্মধারয় সমাস বলতে কী বোঝ?

২.৮ বাক্যাশ্রয়ী ও একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

২.৯ একটি উদাহরণের সাহায্যে নিত্য সমাসের বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

২.১০ সংখ্যাবহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাসের পার্থক্য কী?

৩. উদাহরণ দাও :

সমাসের নাম	ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদ
বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব		
একশেষ দ্বন্দ্ব		
অপাদান তৎপুরুষ		
উপসর্গ তৎপুরুষ		
না-বহুব্রীহি		
সংখ্যা বহুব্রীহি		
সমাহার দ্বিগু		
রূপক কর্মধারয়		
বাক্যাশ্রয়ী সমাস		
অলোপ বহুব্রীহি		

সপ্তম অধ্যায়

সাধু ও চলিত রীতি

'রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার দুই রানি — সুয়োরানি আর দুয়োরানি, তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রানি; একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা, আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা।'— বাংলা ভাষার দুই রূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সমস্ত উন্নত ভাষার এইদুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত বাঙালি পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্য রচনার প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দবহুল এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান নির্ভর যে কৃত্রিম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন, তাকেই আমরা সাধুরীতি বলি। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় —

১. এই গিরির শিখর দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধর-মণ্ডলীরযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপ সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। — (সীতার বনবাস/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

২. এই বলিয়া, আরব সেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দন পূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরবসেনাপতিও, সূর্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। — (অদ্ভুত আতিথেয়তা/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

৩. যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয় তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল, নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। (দুর্গেশনন্দিনী / বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৪. অকপটে মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসে, তবে তাহা বৃথা যায় না। পৃথিবীর বড়োলোকদের এই প্রকৃতি দেখি, তাঁহারা ভালোবাসাতেও বড়ো। তাঁহারা যেমন মানুষকে অকপটে ভালোবাসিতে পারিয়াছেন, এমন সাধারণ লোকে পারে না। (ভালোবাসা কি বৃথা যায়?/ শিবনাথ শাস্ত্রী)

৫. রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। (পল্লীসমাজ/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

— এবার এই উদাহরণগুলির নিরিখে সাধু রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করা যাক।

- তৎসম এবং অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের প্রাবল্য। যেমন : সঞ্চরমান, তরঙ্গ, প্রদোষকালে, অশ্বচালনা প্রভৃতি।
- এই রীতিতে বাক্য গঠন সবসময়ই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে।
- ভাষার সাধু রূপে সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ করা যায়। যেমন : বনপাদপ, প্রসন্নসলিলা, নিরন্তর প্রভৃতি।
- সাধু রীতিতে সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : তাঁহাকে, তাঁহারা, তদীয় প্রভৃতি, আর করিতেছে, হইতে হইবে, পারিয়াছেন ইত্যাদি।
- সাধু রীতিতে শব্দালংকার ও অর্থালংকার-এর প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যায়।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার যে রূপটি কলকাতার শিক্ষিত জনগণের মৌখিক শিষ্ট ভাষার উপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচনার উপযোগী আদর্শ ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাকেই আমরা মান্য চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali) বলে থাকি। যদিও এই মান্য চলিত রীতির সঙ্গে প্রচলিত মুখের ভাষার তফাত আছে। পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার বাংলার চলিত রূপ উত্তর বঙ্গের বাংলা ভাষার চলিত রূপ এক নয়। এর অঞ্চলভেদে মৌখিক চলিত বাংলার বহু রূপভেদ আছে। তাই সেই থেকে ক্রমে চলিত বাংলা বলতে কলকাতা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর অর্থাৎ ভাগীরথী তীরস্থ অঞ্চলের বাংলা ভাষার শিষ্ট চলিত রূপটিই মান্য চলিত বাংলার মর্যাদা পেয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক —

১. আমাদের জাহাজে একটি পার্সি সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড়ো বড়ো চোখ সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোশাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, ইন্ডিয়া লাইক করে না। (য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. নাটোর তো পৌঁছানো গেল। এলাহি ব্যাপার সব। কী সুন্দর সাজিয়েছে বাড়ি, বৈঠকখানা। ঝাড়লণ্ঠন, তাকিয়া, ভালো ভালো দামি ফুলদানি, কার্পেট, সে সবের তুলনা নেই—যেন ইন্দ্রপুরী। কী আন্তরিক, আদরযত্ন, কী সমারোহ, কী তার সব ব্যবস্থা। একেই বলে রাজসমাদর। (নাটোরের কথা/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩. ব্যাপারটা খুব সম্ভবত ১৯২৮ সালে শীতকালে ঘটেছিল — বছর আর তারিখটা ঠিক-মতন মনে পড়ছে না। শ্বশুরালয় গয়া থেকে ফিরছি। দেহরা-দুন এক্সপ্রেস ধরব। সঙ্গে একখানি মধ্যম শ্রেণির রিটার্ন টিকিটের ফিরতি অংশ আছে। (পথচল্‌তি/সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

৪. আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। (বর্ষা/প্রমথ চৌধুরী)

৫. কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। — যামু নাকি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি? (আদাব/সমরেশ বসু)

—এবার উদাহরণগুলির নিরিখে চলিত বাংলার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা যাক —

- চলিত রীতিতে অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশি।
- সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার এই রীতিতে অনেক কম। পরিবর্তে বাগ্‌ধারা কিংবা প্রচলিত বাক্য বিন্যাসের প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যায়।
- সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ চলিত বাংলায় ব্যবহৃত হয়।
- অনুসর্গের ভিন্নরূপ চলিত বাংলায় প্রচলিত। যেমন : সাধুরূপে : দ্বারা, হইতে, সহিত প্রভৃতি, চলিত রূপে : দিয়ে, হতে, সঙ্গে ইত্যাদি।
- সাধু রীতিতে বাক্যবিন্যাসের যে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, তা চলিত রীতিতে অনেকটাই শিথিল এবং প্রায়ই তা পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন —

  কোথায় গেলেন তোমার দাদা?
  তোমার দাদা কোথায় গেলেন?
  দাদা তোমার গেলেন কোথায়? ইত্যাদি।

সুতরাং সাধু ও চলিত রীতির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এদের মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা যায় —

সাধু রীতি	চলিত রীতি
সর্বনামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : তাহাদের, কাহাকেও, যাহাদিগের ইত্যাদি।	সর্বনামের প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : তাদের, কাউকে, যাদের প্রভৃতি।
ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপগুলি প্রয়োগ করা হয়। যেমন :করিতেছে, বলিতেছিলেন, আইস, উঠিয়া প্রভৃতি।	ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত ও একাধিক রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : করছে, বলছিলেন, এসো, উঠে > ওঠে ইত্যাদি।
অনুসর্গের রূপগুলি চলিত রূপের থেকে পৃথক। যেমন : হইয়া, চাইতে প্রভৃতি।	অনুসর্গের রূপগুলি সাধু রূপের থেকে ভিন্ন। যেমন : হয়ে, চেয়ে, দিয়ে, থেকে ইত্যাদি।
বাক্যবিন্যাসরীতি অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট।	বাক্যবিন্যাস রীতি অনেক নমনীয় এবং ক্রিয়াটি বাক্যের ভেতরে চলে আসায় ভাষার গতি বৃদ্ধি পায়।

তাই সাধু থেকে চলিত কিংবা চলিত থেকে সাধু রীতিতে রূপান্তরের সময়, উভয় রীতির এই মৌলিক বিশেষত্বগুলি খেয়াল রেখে রূপান্তর করতে হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

সাধু থেকে চলিত

- জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকতার সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত।

  (চলিত রীতি) জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হয়েছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তার সভাপতি। এ স্বাদেশিকতার সভা। কলকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসত।

- কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

  (চলিত রীতি) কিন্তু আমি আপনাকে যে ঘোড়া দিয়েছি, তা আমার ঘোড়ার থেকে কোনো অংশেই খারাপ নয়; যদি ও জোরে যেতে পারে, তা হলে আমাদের দুজনের প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা।

- তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে করো, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে।

(চলিত রীতি) তোমরা শুকনো গাছের ডাল সকলেই দেখেছ। মনে করো, কোনো গাছের তলাতে বসেছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসেছ। গাছের নীচে এক পাশে একখানি শুকনো ডাল পড়ে আছে।

চলিত থেকে সাধু

- তাকিয়ে দেখল — অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা।

  (সাধু রীতি) তাকাইয়া দেখিল — অনেকটা দূর হইতে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসিতেছে। ভাবিবার সময় নাই। তাহারা বাম পাশের মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করিল।

- অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই মতামত দেবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এখন বড়ো ব্যাপারে—বিশেষ করে এবার চেষ্টায়— কিছু ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়।

  (সাধু রীতি) অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই মতামত দিবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখ হইতে শুনিয়াছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে—বিশেষ করিয়া একক চেষ্টায়— কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে।

- তাহলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কাল রবিবার — ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে তো গেছি।

  (সাধু রীতি) তাহা হইলে কী হইবে বলিবার দরকার ছিল না। কাল রবিবার — ভোরের গাড়িতেই আমরা পিকনিকে বাহির হইব। আজিকার মধ্যে রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করিতে না পারিলেই তো গিয়াছি।

---

১. ঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ 'আপনাদিগের'-এর চলিত ভাষার রূপটি হলো—
(ক) আপনার (খ) আপনি (গ) আমাদের (ঘ) আপনাদের

১.২ 'ওদেরকে'-এর সাধু ভাষার রূপটি হলো—
(ক) তাহাদের (খ) তাহাদিগের (গ) উহাদিগকে (ঘ) উহার

১.৩ সাধু ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—
(ক) ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ (খ) সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ বাহুল্য
(গ) সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ (ঘ) অনুসর্গের আধিক্য

১.৪ চলিত ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়—
(ক) সমাসবদ্ধ পদ (খ) ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ
(গ) শব্দালংকারের প্রয়োগ বাহুল্য (ঘ) তৎসম শব্দের আধিক্য

১.৫ নীচের কোন বাক্যটি ব্যাকরণগত ভাবে ভুল—

(ক) আপনি আসুন। (খ) কোথায় যাওয়া হইতেছে? (গ) এখন অন্ধকার হইয়া এসেছে।
(ঘ) তোমার নাম লেখো।

২. **নির্দেশ অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ বাংলা ভাষার লিখিত কয়টি রূপ দেখতে পাওয়া যায় ও কী কী?

২.২ পাঠ্যবই থেকে একটি সাধু রীতির দৃষ্টান্তবাক্য খুঁজে নিয়ে লেখো।

২.৩ পাঠ্যবই থেকে একটি চলিত রীতির দৃষ্টান্তবাক্য খুঁজে নিয়ে লেখো।

২.৪ সাধু ও চলিত রীতির একটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো।

২.৫ সাধু ও চলিত রীতির একটি মৌলিক প্রভেদ কী?

২.৬ 'ছোটোদের পথের পাঁচালী' কোন রীতিতে লেখা উপন্যাস।

২.৭ সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো : 'একদা আরব জাতির সহিত মুরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল।

২.৮ সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো :'আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন।'

২.৯ সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো : 'বৎসরে দুশো টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন।'

২.১০ সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো : 'ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না।'

২.১১ সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো : 'হেয়ার হিন্দু স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলেদের এত ভালোবাসিতেন যে, একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের আর অন্য কাজ থাকিত না; তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া ছেলেদের খেলা দেখিতেন।'

২.১২ চলিত থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর করো : 'আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।'

২.১৩ চলিত থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর করো : 'তিনি তৎক্ষণাৎ নম্রহৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন।'

২.১৪ চলিত থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর করো : 'স্বপনদার কথা শুনে রঞ্জনের মনের মধ্যে চেপে রাখা রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।'

নির্মিতি

প্রথম অধ্যায়

বাংলা প্রবাদ

সাধারণ ধারণা

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই প্রবাদের প্রচলন আছে। প্রবাদগুলি প্রধানত সুপ্রাচীন মৌখিক পরম্পরার চিহ্ন বহন করে। সুপ্রাচীন পরম্পরা বলেই প্রবাদগুলির কোনো নির্দিষ্ট উৎসকাল চিহ্নিত করা যায় না, কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামও প্রবাদমালার সঙ্গে যুক্ত নয়। বলা যেতে পারে 'ছড়া'-র মতোই প্রবাদও সাবেককালের জনগোষ্ঠী বা জনমানসের হাতে সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাদ-এর আকার সাধারণত এক বা দুই পঙ্ক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐ সীমিত উচ্চারণে বা অভিব্যক্তিতে জীবন অভিজ্ঞতা এবং জীবন মূল্যায়নের এমন দীপ্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সেটি ঐ ভাষার স্থায়ী সম্পদ হিসেবে গৃহীত হয়। একভাবে বলা চলে, প্রবাদ হলো প্রকৃষ্ট লোকবাদ। বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদগুলির মধ্যে প্রাজ্ঞদৃষ্টির অসামান্য প্রকাশ সহজেই লক্ষ করা যায়। প্রবাদগুলি একদিকে সর্বজনীনতা লাভ করেছে, অন্যদিকে তার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে বহুযুগের বাঙালি সংস্কৃতির নানা খুঁটিনাটি। স্থানিক পরিবেশ, লোকাচার, জীবনদৃষ্টি, মূল্যবোধ বা সংস্কার-বিচার প্রবাদগুলির প্রধান ভিত্তি । যুগ বদলালেও এই অভিব্যক্তিগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা' কখনোই পরিবর্তিত দেশকালে 'নাচতে না জানলে স্টেজ বাঁকা'-য় রূপান্তরিত হতে পারে না।

প্রবাদের মূল্য

প্রবাদগুলি কোনো একক ব্যক্তির নয়, গোষ্ঠীজীবনের সম্মিলিত সৃষ্টি। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রবাদগুলির মূল স্রষ্টা বাংলার নারীসমাজ। এই অনুমানের কারণ, প্রবাদগুলিতে অন্তঃপুরের যে বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আটপৌরে জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে সেগুলি নারীজীবনের ঘরকন্নার সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িত। নারী বা পুরুষ যার সৃষ্টিই হোক, প্রবাদগুলিতে সহজভাষায় দার্শনিকতার যে চর্চা লক্ষ করা যায়, তাকে যথাযোগ্য প্রশংসা করতেই হবে। প্রধানত দুটি স্তরে প্রবাদ ক্রিয়াশীল হয়। প্রথমটি তার অভিধার্থ। দ্বিতীয়স্তরে সেই অভিধার্থকে অতিক্রম করে প্রবাদ কোনো চিরন্তন জীবনসত্যকে প্রতিভাত করে। গবেষকদের মতে, প্রবাদে লোকোক্তি যেমন প্রাজ্ঞের চিন্তায় প্রবেশ করেছে, প্রাজ্ঞোক্তিও কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সমবেত জীবনে, দৈনন্দিন ভাষায় বিস্তার লাভ করেছে।

প্রবাদগুলি একদিকে যেমন বাস্তবের নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব, অন্যদিকে দার্শনিক ভাবগভীরতায় সমধিক স্মরণীয়। পরবর্তীযুগে বহু কবি, সাহিত্যিক, সংগীতকারের রচনাতেও এমন অনেক প্রাজ্ঞোক্তির সন্ধান মেলে যাকে 'প্রবাদ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, ভোলা ময়রা, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুকুন্দদাস, নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রবাদের নমুনা

১। তাল ঘষলে গন্ধ মিঠা, নেবু ঘষলে হয় তিতা।
(ক্ষেত্র অনুযায়ী ফল লাভ।)

২। শূন্য কলশির আওয়াজ বেশি।
(সারবস্তুহীন ব্যক্তির আস্ফালন।)

৩। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।
(দারিদ্র্যের অসহ অবস্থা।)

৪। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
(অধিক লোকের সমাগমে কার্য নষ্ট।)

৫। যার কর্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।
(যে কাজে যে অভ্যস্ত, তার পক্ষেই সেই কাজ করা সহজ।)

৬। যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।
(অযোগ্য লোক ধনবানের অর্থ আত্মসাৎ করে।)

৭। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
(অতি ঘনিষ্ঠজনের গুণের কদর হয় না।)

৮। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।
(প্রতাপশালীদের সংঘর্ষে সাধারণের জীবন ধ্বংস হয়।)

৯। কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি।
(কাজ করিয়ে পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা এবং দুর্নাম করা।)

১০। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
(খল ব্যক্তির বন্ধুত্বের থেকে বন্ধুহীন থাকা শ্রেয়।)

১১। পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।
(পতনের পূর্বে মাত্রাধিক সক্রিয়তা।)

১২। ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন-হাত।
(বাহ্যিক বাবুয়ানির সমালোচনা।)

১৩। কাজের মধ্যে দুই
খাই আর শুই।
(আলস্যময় জীবনচর্চার প্রতি ব্যঙ্গ।)

১৪। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।
(একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি)

১৫। তাদের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়।
(সম্পূর্ণ বিরোধী)

১৬। ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।
(পূর্বঅভিজ্ঞতার নিরিখে আশঙ্কা করা।)

১৭। হেলে ধরতে পারে না
কেউটে ধরতে যায়।
(যোগ্যতার সীমা না বুঝে কাজ করার চেষ্টা।)

১৮। মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।
(বড়ো কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করা)

১৯। বাজারে আগুন লাগলে পিরের ঘর মানে না।
(দুঃসময় কোনো সৎ-অসৎ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করে না।)

২০। এক হাতে তালি বাজে না।
(দুপক্ষের দোষ থেকেই বিবাদ হয়।)

* উপরের প্রবাদগুলিকে বাক্যে সার্থকভাবে ব্যবহার করো।
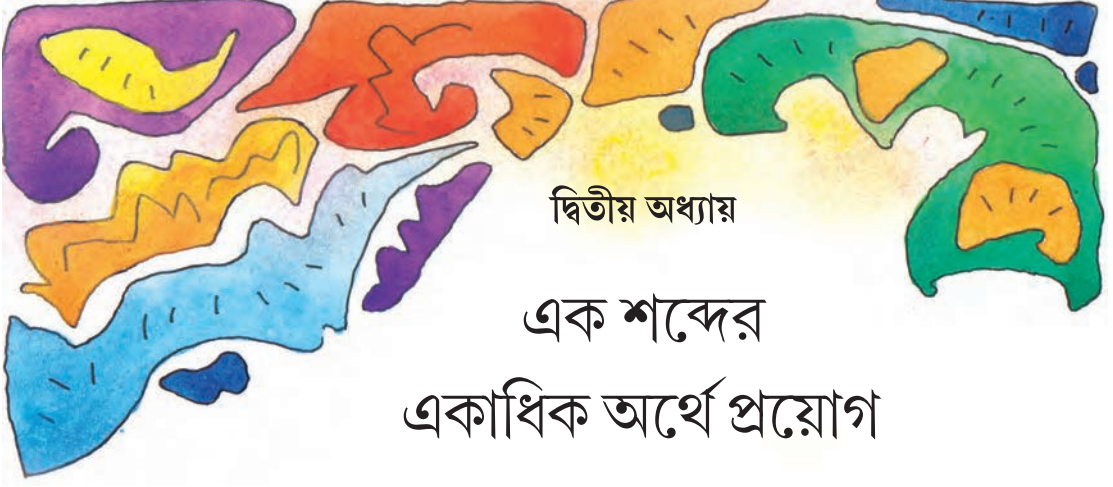
দ্বিতীয় অধ্যায়

এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ

বাংলা ভাষার একটি মজার বৈশিষ্ট্য আছে, একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ আমাদের ভাষার একটি মৌখিক রীতি। একই শব্দ আলাদা আলাদা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ ও ভাব প্রকাশ করে। এই অধ্যায়ে উদাহরণ সহযোগে সেই বিষয়টিই সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত একই শব্দগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই আলোচনায় চোখ, মাথা, হাত, বুক এই চারটি বিশেষ্য পদ; পাকা, কাঁচা, বড়ো, ছোটো এই চারটি বিশেষণ পদ এবং কাটা, বসা এই দুটি ক্রিয়াকে আলাদা আলাদা বাক্যে ব্যবহার করে দেখানো হলো কীভাবে একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে এবং ভাষার সৌন্দর্য ও পরিধি বিস্তারে সহায়তা করে।

বিশেষ্য :

চোখ

১. প্রথমে লোকটির স্বরূপ বুঝতেই পারিনি, পরে তোমার কথায় আমার চোখ ফুটল (প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা)।

২. দিদিভাই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে (প্রমাণসহ বোঝানো) দিল যে দোকানের দাড়িপাল্লাটি গোলমেলে।

৩. গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে মাথায় ডাব পড়ে যাওয়ায় চোখে সর্ষেফুল দেখলাম (দিশাহারা অবস্থা।)

৪. বাচ্চাকে চোখে চোখে রেখো যেন পড়ে না যায়। (সর্তক দৃষ্টি রাখা)

৫. আগাম খবর না দিয়ে সাতসকালে মামাবাড়ি পৌঁছাতে দিদিমার চোখ কপালে উঠল (অতিমাত্রায় বিস্মিত হওয়া)।

৬. রমেশের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখে প্রতিবেশীদের চোখ টাটিয়েছে (হিংসা করা)।

৭. রামবাবু বন্যাত্রাণে মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে প্রমাণ করলেন যে ধনী হলেও তাঁর চোখের চামড়া (লজ্জা) নেই।

৮. পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় রেশমার অভিনয় ছিল চোখে পড়ার মতো (দ্রষ্টব্য)।

৯. মা মরা ছেলেটি ক্রমশ কাকিমার চোখের বালি (অপছন্দের ব্যক্তি) হয়ে উঠেছিল।

১০. জমিদারের নায়েব চোখ রাঙিয়ে (শাসন করে) দরিদ্র প্রজাদের জানিয়ে দিল যে দ্বিগুণ কর দিতেই হবে।

মাথা

১. সেনাপতির আদেশ মাথা পেতে নিয়ে (শিরোধার্য করা) সৈন্যদল বীরবিক্রমে শত্রুশিবির জয়ের জন্য এগিয়ে গেল।

২. শ্যামবাবু পাড়ার অনুষ্ঠানে বেশি চাঁদা দিয়ে এমন ভাব করছেন যেন তিনি সবার মাথা কিনে নিয়েছেন (প্রভুত্বের ভাব)।

৩. সবার মাঝখানে ছেলের উদ্ধত আচরণ প্রত্যক্ষ করে তাঁর লজ্জায় মাথা কাটা (অপমানিত হওয়া) গেল।

৪. দিদিমা ছোটো নাতিকে অতিরিক্ত আশকারা দিয়ে তার মাথাটি খেয়েছেন (স্বভাব নষ্ট করা)।

৫. রেহান বন্ধুর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আমার মাথা খা (দিব্যি দেওয়া) কিন্তু ওদের সঙ্গে ঝগড়া করিস না।’

৬. জিনিসপত্রের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় বড়দার পক্ষে এত বড়ো সংসার চালানো মাথা ব্যথার (দুশ্চিন্তা) কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭. মাত্র দুমাস পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা তাই অন্যান্য বিষয়ে মাথা ঘামানো (চিন্তা করা) বন্ধ করো।

৮. প্রবীণ রহিমচাচা গ্রামের মাথা (প্রধান ব্যক্তি) বলে তাঁর কথা সবাই মানে।

৯. ছোটোবেলা থেকেই পড়াশুনায় পিটারের মাথা (বুদ্ধিমত্তা) খুব ভালো বলে সবাই তাকে ভালোবাসে।

১০. অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে (প্রবঞ্চনা করে) বেশিদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা যায় না।

১১. বাঁচার রসদ জোগাড় করার জন্য শেরপারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে (কঠোর পরিশ্রম করে)।

হাত

১. ভাগ দেবার লোভ দেখিয়ে অমল ভাইকে হাত করে (বশে আনা) আচারের শিশি চুরি করেছে।

২. দুঃখী মানুষদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁর হাত খোলা (দানশীল) স্বভাবের কথা সবাই জানে।

৩. শরিকি গোলমালের জেরে এই নিয়ে আমাদের পাড়ার জীর্ণ মল্লিকবাড়িটি পাঁচবার হাত বদল (মালিকানা পরিবর্তন) হলো।

৪. আত্মাভিমানী মানুষ শত দুঃখেও অন্যের কাছে হাত পাতে না (সাহায্য চাওয়া)।

৫. ডাক্তারবাবুর হাত যশে (দক্ষতার জন্য খ্যাতি) বিধবার একমাত্র সন্তান এ যাত্রা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এল।

৬. কাছারিবাড়ির নতুন কর্মচারীটির হাতটানের (চুরির অভ্যাস) কথা কিছুদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল।

৭. দরিদ্র মানুষগুলিকে সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও আইনের দ্বারা আমার হাত বাঁধা (নিরুপায়)

৮. শ্রমিকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ফলে মালিক কারখানা বন্ধ করে তদের হাতে মারার বদলে ভাতে মারলো (প্রহারের পরিবর্তে কৌশলে আর্থিক ক্ষতিসাধন)।

বুক

১. অসুস্থ ছেলেটি মায়ের বুকে (অঙ্গ) মাথা পেতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

২. আর্ত, নিপীড়িত মানুষদের দুর্দশা দেখে স্বামীজির বুক ফেটে (হৃদয় বিদীর্ণ) যায়।

৩. স্বদেশজননীর বুকের মাঝে (অন্তরাত্মা) সন্তানের জন্য রয়েছে স্নেহ, মায়া, মমতা।

৪. কুম্ভবীর একাই বুক দিয়ে (প্রাণ দিয়ে) নকল বুঁদিগড় রক্ষা করছে।

৫. ওকে ভয় দেখিও না, ওর ডাকাতের মতো বুক (সাহসী)।

৬. ভারতবর্ষের বুকে (মাটিতে) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে।

৭. একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের বুক শোকে পাথর (স্তব্ধ) হয়ে গেছে।

৮. তোমার জন্য রয়েছে এক বুক (অপর্যাপ্ত) ভালোবাসা।

৯. হাতে হাত আর বুকে বুক (সম্প্রীতির ভাব) মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করব।

১০. এই বিপদের দিনে বড়োভাই হিসেবে তোমাকেই বুক বাঁধিতে (সাহস সঞ্চয়) হবে।

বিশেষণ :

পাকা

১. প্রখর তপন তাপে জনজীবন অতিষ্ঠ হলেও পাকা (পক্ক) আম কাঁঠালের স্বাদ জিভে জল এনে দেয়।

২. সাগরদিঘির ধার দিয়ে পাকা (কংক্রিট) রাস্তা ধরে সোজা হাঁটলেই তোমার চরে পৌঁছাবে।

৩. বয়স অল্প হলেও ছেলেটি সব বিষয়েই পাকা পাকা (বয়সোচিত নয় এমন) কথা বলে।

৪. রঞ্জনকাকু উইলিয়মকে জড়িয়ে ধরে পাকা (চূড়ান্ত) কথা দিলেন যে পঁচিশে ডিসেম্বর একসঙ্গে কেক কাটবেন।

কাঁচা

১. গ্রামের কাঁচা (অস্থায়ী) রাস্তা বর্ষার জলকাদায় পিছল হয়ে আছে।

২. কাঁচা (তরুণ) বয়স বলেই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারছ না।

৩. কাঁচামাল (স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্য) আমদানি-রপ্তানির জন্য জাতীয় সড়কটি ব্যবহার করা হয়।

৪. কাঁচা ঘুম (অসম্পূর্ণ) ভেঙে যাওয়ায় কুম্ভকর্ণ বিকট চিৎকার করে উঠল।

৫. ধূর্ত মেজবাবুর সঙ্গে বিবাদ বাধানোর মতো কাঁচা কাজ (ভুল) কোরো না।

৬. এমন কাঁচা লেখা (নিম্নমান) কখনোই সংবাদপত্রে ছাপা হবে না।

৭. কাঁচা খাতায় (খসড়া) আগে হিসাবটা তুলে রাখো, পরে পাকা করবে।

বড়ো

১. বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে বড়ো বড়ো কথা (স্পর্ধিত উক্তি) সবাই বলে।

২. বাড়িতে আজ বড়ো কুটুম (শ্যালক) এসেছে তাই ভালো ভালো রান্না হচ্ছে।

৩. দেখলাম যে দোষ করেছে সেই ছেলেটিই বড়ো গলায় (চিৎকার করে) সাফাই গাইছে।

৪. আমাদের গ্রামের কানুবাবু বড়ো লোক (ধনী ব্যক্তি) হলেও ভীষণ কৃপণ।

৫. বিদ্যাসাগর, রামমোহন, হাজী মহসিন, মাদার টেরিজার মতো বড়ো মানুষরাই (মহাপুরুষ) আমাদের আদর্শ।

৬. হেড আপিসের বড়োবাবু (প্রধান ব্যক্তি) মানুষ হিসেবে খুব মিশুকে এবং মজাদার।

৭. সরলার মা চোখের জল মুছে মিজানুর-কে আশীর্বাদ করে বললেন ‘বড়ো হও’ (খ্যাতিমান)।

৮. কলেজে গিয়ে ছেলেটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে বড়ো মানুষী (ধনী লোকের আদব-কায়দা) চাল শিখেছে।

৯. এত বড়ো বাড়িতে (আকার) জাভেদ আর তার বাবা-মা মাত্র এই তিনজন বাস করে।

১০. উনি বড়ো মুখ করে (প্রত্যাশা) কথাটা বলেছেন তাই আর উপেক্ষা করতে পারলাম না।

ছোটো

১. অসহায়, দরিদ্র মূর্খ স্বদেশবাসীকে ছোটো নজরে (ঘৃণা) দেখো না।

২. গ্রামের ছোটো (আকার) কুটিরগুলি গাছের সবুজ পাতার মনোরম ছায়ায় ঢাকা।

৩. ছোটো (বয়স) থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক, সত্যবাদী এবং পরের দুঃখে কাতর।

৪. এত লেখাপড়া শিখেও তুমি যে এমন ছোটো লোকের (অভদ্র) মতো আচরণ করবে তা বুঝতে পারিনি।

৫. জমিজমা সংক্রান্ত এই সামান্য বিষয়ের মীমাংসা ছোটো আদালতেই (নিম্ন আদালত) হয়ে যাবে।

৬. তোমার মিথ্যা কথার জন্য আজ আমি সবার কাছে ছোটো (সম্মান নষ্ট হওয়া) হয়ে গেলাম।

৭. সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে মেজকাকার মুখটা শুকিয়ে ছোটো (সংকুচিত) হয়ে গেছে।

৮. ছোটো ছোটো (সামান্য) কাজের মধ্যে দিয়েও দেশের মঙ্গল করা সম্ভব।

৯. শারীরিকভাবে দুর্বল বলে ওকে ছোটো (হেয়) কোরো না, ওর মনের জোর প্রবল।

ক্রিয়া :

কাটা

১. সামান্য বিষয় নিয়ে দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি (তর্ক বিতর্ক) করা ঠিক নয়।

২. যেকোনো বিষয়ে আলোচনা হলেই শ্যামল ফোড়ন কাটতে (মতামত দান) শুরু করে।

৩. আমাদের গ্রামে পানীয় জলের অভাব মেটানোর জন্য জমিদারবাবুরা নতুন পুকুর কাটিয়েছেন (খনন করা)।

৪. মাটির উঠানে বসে সতু আর নরু আপন মনে খাতায় আঁক কাটছে (অঙ্কন করা)।

৫. যাত্রার দলে থাকাকালীন তারাপদ নতুন কায়দায় টেরি কাটতে (চুল বিন্যাস করা) শিখেছে।

৬. একলা থাকার অভ্যাস হয়ে গেলেই দেখবে ওসব ভূতের ভয়-টয় কেটে যাবে (সাহস হওয়া)

৭. ভজহরিবাবুর মেয়ের বিয়েতে প্রচুর মিষ্টান্ন লাগবে তাই ময়রা দ্বিগুণ পরিমাণে ছানা কেটেছে (প্রস্তুত করা)।

৮. বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য পিটার ও রবিন একটি মোটা অঙ্কের চেক কেটে (লিখে দেওয়া) দিয়েছে।

৯. তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অষ্টম শ্রেণির ওয়াহিদার বক্তব্যের শুরুটা ভালো হলেও শেষে তাল কেটে (সমতা নষ্ট হওয়া) কেটে গেল।

বসা

১. আগামীকাল গ্রাম সংসদের মিটিং বসবে (অনুষ্ঠিত হওয়া)।

২. দইটা এখনও বসেনি (জমে যাওয়া)।

৩. এভাবে বসে (নিষ্কর্মা হওয়া) থাকলেই দিন চলবে?

৪. তালায় চাবিটা বসছে (মাপসই হয়ে লাগা) না।

৫. দুধের শিশুটি দোলনায় বসে (অধিষ্ঠান করা) দোল খাচ্ছে।

১. **নীচে প্রদত্ত শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেখিয়ে পৃথক বাক্যে ব্যবহার করো :**

নাক, কান, সাদা, কালো, লাগা, বাঁধা।

২. **কথা, সোজা, কঠিন শব্দগুলি ৫টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি করে বাক্য রচনা করো।**

৩. **নীচের ছকটি পূরণ করো :**

শব্দ	যে অর্থে ব্যবহার করতে হবে	বাক্য
অঙ্ক	নাটকের পরিচ্ছেদ সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন	
অর্থ	তাৎপর্য প্রয়োজন	
কথা	বিষয় প্রতিশ্রুতি	
কাজ	লাভ পরিশ্রম	
জল	খাবার বিপদ	
মন	উদার বিষণ্ণ হওয়া	
খোলা	মুক্ত সরল	
সাদা	সরল অলিখিত	
রাখা	স্থাপন করা বাঁচানো	

তৃতীয় অধ্যায়

পত্রলিখন

পত্র-নমুনা—১

বিষয় : বরেণ্য লেখকের বসতবাটী সংরক্ষণ

সম্পাদক সমীপেষু
দৈনিক ভোরের বার্তা,
৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা : ৭০০০৭৩

১২/০১/২০১৫

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর আবাসগৃহটি বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় অনাদরে, অবহেলায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নক্ষত্র হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাস অত্যুজ্জ্বল কথাসাহিত্যরূপে মর্যাদা পেয়েছে। বহু পুরস্কারে সম্মানিত এই বিরল-ব্যক্তিত্বের অধিকারী লেখক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গর্ব। তাঁর বসতবাটীর এহেন দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছি। আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং আধিকারিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। অবিলম্বে ঐ আবাসগৃহটি সরকারি উদ্‌যোগে মেরামত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। বাড়ির ফটকে একটি প্রাসঙ্গিক ফলকস্থাপনও প্রয়োজন। সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো মহান সাহিত্যিকের স্মৃতিবিজড়িত বসতবাটীকে ঐতিহ্যশালী-ভবন হিসেবে ঘোষণা করাও অত্যন্ত জরুরি।

আশা করি, আমার এই পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নমস্কারান্তে
রাকা হালদার

১৯, সূর্য দত্ত লেন
কলকাতা : ৭০০০০৬

পত্র-নমুনা—২

বিষয় : জীর্ণ সেতু সংস্কার

সম্পাদক সমীপেষু
সমাচার সারাদিন,
২১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ১৫/০২/২০১৫
কলকাতা : ৭০০০০৯

সবিনয় নিবেদন,

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহর সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীতে ১৯৭১ সাল নাগাদ একটি সেতু নির্মিত হয়েছিল। তারপর বহুদিন এই গৌণ সেতুটির কোনো প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। বর্তমানে এই সেতুটির জরাজীর্ণ অবস্থা। এই সেতু দিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী-বোঝাই গাড়ি যাতায়াত করে। কয়েকটি স্কুল এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই সেতু নিয়মিত ব্যবহার করে। সেতুটির অবস্থা এতই বিপজ্জনক যে যেকোনো দিন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করতে চাইছি। তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে এবিষয়ে সত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহলে ভালো হয়। সেতুটির সংস্কার করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

আশা করি, এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমার পত্র প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

সুভাষপল্লি নমস্কারান্তে
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর বিনয়কুমার বারিক

পত্র-নমুনা—৩

বিষয় : জলাভূমি সংরক্ষণে পদক্ষেপগ্রহণ

সম্পাদক সমীপেষু
দৈনিক সুপ্রভাত, ৮/১১/২০১৪
৪৫, তপসিয়া রোড,
কলকাতা : ৭০০০৪৬

সবিনয় নিবেদন,

বীরভূমের দক্ষিণপাড়া সংলগ্ন পোদ্দারবাগান অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জলাভূমি রয়েছে। সম্প্রতি ঐ জলাভূমির পশ্চিমাংশে জনৈক অসাধু প্রোমোটার ‘কৃষ্ণ-টাওয়ার’ নামে একটি বহুতল আবাসন বানানোর কাজে ঐ জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণকার্য চালাচ্ছেন। আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের

মাধ্যমে এই ভয়ংকর ঘটনাটি আমি সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নজরে আনতে চাইছি। গোপনে এই ধরনের সবুজ ধ্বংসের প্রক্রিয়া সমস্ত অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে বিপন্ন করবে। এ ধরনের যেকোনো কাজই দেশের আইনবিরুদ্ধ। যত দ্রুত এই ঘটনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, ততই মঙ্গল। অবিলম্বে জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণকাজ স্থগিত করা হোক এবং দোষী প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করা হোক।

আশা করি, ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনি আমার পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

সিউড়ি
বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১

নমস্কারান্তে
শেখ আবিদ আলি

---

১. তোমার এলাকার ঐতিহ্যবাহী পুরনো গ্রন্থাগারটির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে সংবাদপত্র সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লেখো।

২. হাসপাতালের সামনে জোরে মাইক বাজানো অমার্জনীয় অপরাধ। এই মর্মে সচেতনতা গড়ে তুলতে সংবাদপত্রে চিঠি লেখো।

৩. বন্যার প্রকোপে গ্রামের বহু কৃষিজমি নদীর গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে— নদীর পাড়গুলির স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এবিষয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৪. তোমার অঞ্চলে যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সম্পাদককে চিঠি পাঠাও।

৫. গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিকে একটি চিঠি প্রেরণ করো।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবন্ধ রচনা

রচনা—১

কন্যাশ্রী : নারীকল্যাণে অগ্রণী ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ

‘কন্যাশ্রী’ শুধু একটি প্রকল্পের নাম নয়। ‘কন্যাশ্রী’ এক অপরূপ স্বপ্নের বাস্তবায়ন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চপ্রশংসিত এই প্রকল্প। এমনকি উন্নত, অগ্রসর দেশগুলিও এই প্রকল্পকে অনুকরণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বাংলার কন্যারত্নেরা, বঙ্গসমাজের মেয়ের দল। অবহেলা, বঞ্চনার যুগান্তে এই প্রকল্প ঘোষণা করলো তাদের সামাজিক সুরক্ষার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের। দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল এক নতুন আলোর ইশারা। নানাস্তরে, নানান কাঠামোয় সমাজে কন্যার ভূমিকা, কন্যার সাফল্যকে নিশ্চিত করতে সরকারি এই প্রকল্প আবির্ভূত হলো। নতুন সময়ের, নতুন সমাজের এ এক অনন্য অঙ্গীকার, এক অনবদ্য সংকল্প।

আমাদের রাজ্যে ১৩ থেকে ১৮ বছর এবং ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি ছাত্রীদের জন্য এক অভূতপূর্ব প্রকল্প হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালু করেছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি ৭৩ হাজার মানুষ আছে যাদের বয়স ১০ বছর থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ৪৮.১১ শতাংশই মহিলা। আমাদের রাজ্যে মহিলাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা অধিক, বিশেষত গ্রামীণ অংশে এই বাল্যবিবাহের হার আরো বেশি। এই মহিলাদের জীবনের পথে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এগিয়ে

যাওয়ার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পটি ঘোষণা করেছেন। বিদ্যালয়-ছুট, বাল্যবিবাহ, অল্পবয়সে মাতৃত্ব এবং পারিবারিক হিংসার হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাতে সব চাইতে উপযোগী হলো বিদ্যালয়ে অধিক সময়ে থাকা। এর ফলে পড়াশুনোর মাধ্যমে যেমন গড়ে উঠবে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, তেমনি এড়ানো যাবে বাল্যবিবাহ বা পারিবারিক হিংসাকেও।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের দুটি অংশ — (১) বার্ষিক অনুদান হিসেবে ৫০০ টাকা এবং (২) এককালীন হিসেবে ২৫০০০ টাকা। প্রথম অংশটি পাবে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের অবিবাহিত ছাত্রীরা এবং যাদের বয়েস ১৮ বছর হয়ে গেছে, তারা পাবে দ্বিতীয় অংশটি। বার্ষিক অনুদানটি এ বছরে বেড়ে হয়েছে ৭৫০ টাকা। যেসব ছাত্রীর পারিবারিক আয় বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার নীচে কিংবা বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন বা ৪০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী তারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এই প্রকল্প জোর দিয়েছে অবিবাহিত থাকা এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকার উপর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বছরে ১৮ লক্ষ ছাত্রীকে বার্ষিক ভাতা এবং ৩.৫ লক্ষ ছাত্রীকে এককালীন অনুদান দেওয়ার কথা বলেছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার পর আমাদের সমাজের মেয়েদের মধ্যে যে যে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে তা হলো :

- মেয়েদের বাল্য বিবাহে অনীহা। বহুক্ষেত্রে এই ধরনের বিবাহে মেয়েরাই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। তারা আইনের সাহায্যও নিচ্ছে।
- বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে টাকা পয়সার অভাবে মেয়েদের পড়াশুনো যে বন্ধ হয়ে যেত, তা অনেকখানি প্রতিরোধ করা গেছে। মাধ্যমিক পাশের পর তারা এগিয়ে চলেছে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের দিকে।
- আমাদের রাজ্যের গরীব মেয়েদের অপুষ্টি ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির ক্ষেত্রেও কন্যাশ্রী প্রকল্প উন্নতির দিশা দেখাচ্ছে।
- দারিদ্র্যের কারণে নারীপাচার যে সামাজিক ব্যাধির মতো আমাদের রাজ্যে ছেয়ে গিয়েছিল, কন্যাশ্রী প্রকল্প সেখানেও পালন করেছে ইতিবাচক ভূমিকা।

মাত্র দু-বছরের মধ্যেই এই কন্যাশ্রী প্রকল্প স্বপ্ন জাগিয়েছে পশ্চিমবাংলার মেয়েদের চোখে। তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের জীবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় নারীকে আপনভাগ্য জয় করার যে কথা বলেছিলেন, আজ তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। আজকের নারী তাই বলতে পারেন : 'আমি প্রগতি/আমি কন্যাশ্রী, আমি সাহস/আমি কন্যাশ্রী, আমি প্রতিজ্ঞা/আমি কন্যাশ্রী। ২৭ লক্ষ কন্যা আজ এগিয়ে চলেছে কন্যাশ্রীর পথে। এসো, যোগ দাও তুমিও।'

রচনা—২

খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তা

বহু প্রাচীন প্রবাদেই বলা আছে খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা : 'সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস।' একজন মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অর্থ দেহ-মন-আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ। কোনোযন্ত্রযদি নিথর হয়ে পড়ে থাকে তা জং পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের শরীরও এক ধরনের যন্ত্র, অব্যবহারে রোগ বাসা বাঁধে, চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায়। তাই দৈহিক চর্চা প্রয়োজন। সেই দৈহিক চর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োজন খেলাধুলো।

খেলাধুলোর ব্যাপক প্রসার শরীরচর্চার বিকাশ সেক্ষেত্রে সমাজে নবপ্রাণের জোয়ার আনতে পারে। অগণিত মূঢ় ম্লান মূক মুখে জীবনের আনন্দমুখর ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পারে, "All work and no play makes jack a dulldeoy" কথাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ছাত্রজীবনে খেলীধুলোর গুরুত্ব অসীম। পুস্তক পাঠ্য ও শরীরচর্চা এ দুয়ের সমবায়েই শিক্ষার্থীর দেহ-মন-আত্মার বিকাশসাধন হতে পারে। গ্রন্থকীট শিক্ষার্থী বা জ্ঞানার্থী কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থেকে যদি শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকটিকে উপেক্ষা করে, তবে তার জ্ঞানচর্চা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে বিঘ্নিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অবকাশের অযোগ্য ব্যবহারে জীবনে আসে ক্লান্তি, বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমি। পুস্তক পাঠ, জ্ঞানচর্চা ও উচ্চটিন্তনের পাশাপাশি অবসরকে আলস্যের নিষ্ক্রিয়তায় ভরিয়ে না তুলে কিংবা ভ্রান্তপথে চালিত না করে বিভিন্ন অন্তর্বিভাগীয় বা বহির্বিভাগীয় খেলাধুলোর মধ্যে সদ্ব্যবহার করাই সুফলদায়ক।

সমস্ত খেলাধুলোই কঠোর নিয়মকেন্দ্রিক। সুতরাং খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করলেই বিশেষ বিশেষ খেলার নিয়ম নীতিগুলো ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়। খেলাধুলোয় দক্ষতা অর্জনের অনুশীলন, নিয়মগুলিকে আয়ত্ত করা, বিপক্ষকে অতিক্রম করার মানসিকতা থেকে ব্যক্তি-চবিত্রের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু গুণ সংযোজিত হয়। যেগুলি তার সংঘাতময় জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে লেগে যায়। খেলাধুলো মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়। খেলাধুলোর অন্তর্গত নিয়মগুলি মেনে চলতে যে কোনো খেলোয়াড় বাধ্য থাকে। আবার খেলাধুলোয় সঠিক সময়সীমা বা সময়ানুবর্তিতার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সময়ের অসদ্ব্যবহারে বা বৃথা কালক্ষেপে খেলাধুলোর মূল ধর্মটাই বিনষ্ট হয়ে পড়ে। বস্তুত: জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সময়ানুবর্তিতার একটা নিগূঢ় ভূমিকা রয়েছে।

একতা, সংঘবদ্ধতা ও সমষ্টির প্রতি আনুগত্য বোধের শিক্ষা খেলাধুলো থেকে পাওয়া যায়। দলবদ্ধভাবে যেসব খেলা সম্পন্ন হয় সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রীড়ার সাফল্য আনয়নেরপ্রধান শর্ত। একটি দল যখন প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের সম্মিলিত প্রয়াসে, একতালে-একসুরে পরিচালিত হয় তখন দলীয় শক্তির সার্বিক বিকাশ ঘটে এবং ক্রীড়ায় সাফল্য আসে। পারস্পরিক আপস বা বোঝাপড়া এবং ব্যক্তিস্বার্থের পরিপুষ্টির স্থল সমাজ স্বার্থকে বড়ো করে দেখার প্রবণতা খেলাধুলো থেকে মানুষ সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

খেলাধুলো মানুষের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে, সংগ্রামস্পৃহাজাগিয়ে তোলে এবং জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে মানানসই করে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। সাফল্যে খেলোয়াড় যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে, তেমনি ব্যর্থতাকেও একটি অনিবার্য, প্রত্যাশিত এবং সম্ভাব্য ফল হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জন করে। এছাড়াও খেলাধুলো মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানোর সহায়ক, খেলাধুলোয় সততা ও নিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নীতি ও সততার বিসর্জনে খেলাধুলোর আকর্ষণটাই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

পৃথিবীব্যাপী খেলাধুলোর আজ ব্যাপক প্রচলন লক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সাফল্য একটি দেশের সম্মান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। অপরদিকে ব্যক্তিগত দক্ষতার যথেষ্ট মূল্য ও সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে সেই অর্থজীবন রঙ্গভূমির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। উত্থানও পতনের দ্বৈত ভূমিকায় সর্বদা উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাও তীব্র মানসিক অস্থিরতার টানটান অনুভূতি।

রচনা—৩

ছাত্রসমাজ : আদর্শ ও কর্তব্য

একটি বাড়ি যেমন তার মজবুত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি মানুষের জীবনও গড়ে ওঠে ছাত্রজীবনের উপর ভিত্তি করেই। ছোটো থেকে বড়ো হওয়ার পথে যে আদর্শ ও কর্তব্যের দিকচিহ্নটি ক্রমশ ফুটে উঠে, তা-ই শেষপর্যন্ত জীবনের স্বরূপকে স্পষ্ট করে। এই আদর্শ ও কর্তব্য যদি বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকে বরণ করে, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনও হয়ে উঠবে অন্ধকারময় ও হতাশাগ্রস্থ। তাই ব্যক্তি মানুষ হিসেবে, সামাজিক মানুষ হিসেবে, নাগরিক হিসেবে এক সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনের অভ্যাসই সমিধ জোগায়।

প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবন ছিল কঠোর অভ্যাস ও পরিশ্রমের সময়। সে-সময় ছাত্রদের গুরুগৃহে বাস করতে হতো। সেখানে শুধু পড়াশুনোই হত না, অধ্যয়নের বাইরে সংযম ও শৃঙ্খলাবোধের

অভ্যাস করতে হতো। ক্রমে ছাত্রজীবনের প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় পড়াশুনো, ছাত্রনাং অধ্যয়ন তপঃ — অধ্যয়নই ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা। এর ফলে তৈরি হতে লাগল কিছু গ্রন্থকীট। বইয়ের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এদের কোনো যোগ রইল না। সমাজও এই গ্রন্থকীটদের এক আলাদা বৃত্তের মধ্যে রাখতে চাইল। সামাজিক সমস্যায়, মানুষের বিপদে আপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা মহামারীর মতো ঘটনায় আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াল যারা, তাদের সঙ্গে গ্রন্থকীটদের সৃষ্টি হলো দূরত্ব। পড়াশুনোয় ভালো মানে ভালো ছেলে আর খারাপ মানেই খারাপ ছেলে, এমন ভাবে ভাগ হয়ে গেল ছাত্রসমাজ।

আসলে এখানে শিক্ষার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধেই আমরা ভুল ভেবেছি। শিক্ষা মানে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, শিক্ষা মানে ছাত্রছাত্রীদের দেহ-মন-চেতনার সার্বিক বিকাশ ঘটানো, সমাজসত্তা ও বিবেকবোধকে জাগ্রত করা। অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই রয়েছে ছাত্রজীবনের আদর্শ ও কর্তব্য। এই আদর্শ ও কর্তব্য গড়ে তোলার জন্য দেশের সরকারও শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা করে থাকে। কারণ সামান্য পরিকল্পনার অভাব, সতর্কতার অভাব, একটু অবহেলা গোটা জীবনটা নষ্ট করে দিতে পারে।

আমাদের দেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত। নিরক্ষরতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব, দারিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি আমাদের নিত্য সঙ্গী। পড়াশুনোর পাশাপাশি ছাত্রসমাজই পারে এই সব সমস্যার মোকবিলা করতে। নিরক্ষরতা জাতির জীবনে অভিশাপ। সেখানে শিক্ষার আলো ফেলতে পারে ছাত্রসমাজ। বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রয়োগ করে ধর্মীয় সংকীর্ণতার উপরে উঠে কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। বছরের মধ্যে দীর্ঘ অবকাশগুলিতে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে অবহেলিত মানুষদের সাহায্য করতে।

কিন্তু এই সময়ে এক বিভ্রান্তি যেন গ্রাস করছে ছাত্রছাত্রীদের। পরীক্ষার হলে নৈরাজ্য, শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি কদর্য আচরণ, ছাত্ররাজনীতির নামে গুন্ডামি যেন প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তি ও আদর্শহীনতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এর প্রতিবাদ করেন। ছাত্রছাত্রীরাও নিজের ভুল বুঝতে পারেন। আশা করা যায় রাষ্ট্রব্যবস্থা এই অবস্থার কথা চিন্তা করে নতুন ভাবে পরিকল্পনা করবে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র পড়াশুনো ও সমাজমনস্কতার চর্চা হবে। ছাত্রসমাজের হাত ধরেই ঘটবে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি।

রচনা—৪

বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কার

সংস্কার বলতে বহু যুগ ধরে চলে আসা প্রচলিত ধ্যানধারণা ও অন্ধবিশ্বাসকে বোঝায়। অন্যদিকে বিজ্ঞানমনস্কতার জন্ম মানুষের যুক্তিবোধ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মানবমন অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতূহলী। সে চায় জাগতিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে নিহিত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারগ্রস্ত মনের সঙ্গে সত্যান্বেষী মানবমনের নিত্য-বিরোধ। কারণ সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধত্বের বশবর্তী হয়ে মানুষ, জাগতিক সমস্ত কিছুর সঙ্গে মেনে ও মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত। অথচ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চিরকাল আপসহীন, এবং যে-কোনো মূল্যে সত্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর।

আদিমযুগে আগুনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো মানবমনের জ্ঞানান্বেষণের আগুনও উদ্দীপিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথে তখন থেকেই আদিম পৃথিবীর বুকে মানুষের পথ হাঁটা শুরু। সভ্যতার ইতিহাসে মনন-নির্ভর শাণিত যুক্তির সঙ্গে প্রচলিত সংস্কারের এই দ্বন্দ্ব সে-সময় থেকেই প্রবহমান ছিল। তবে প্রামাণ্য ইতিহাসের নিরিখে মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন বলয়ে দাঁড়িয়ে সম্ভবত গ্যালিলিওই প্রথম যুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চার দিকে মানুষকে পথ হাঁটতে শিখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে গ্যালিলিওর আগে ও পরে কোপারনিকাস, কেপলার, নিউটন, রজার বেকন প্রমুখ মনীষীদের হাত ধরে সারা বিশ্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের নবজাগরণ ঘটে। মধ্যযুগের এই শেষলগ্নকেই আমরা 'Age of Reasons' ও 'Age of Enlightenment' বলে অভিহিত করি। তখন থেকেই ক্রমে সারা পৃথিবীতে ধর্মীয় সংস্কার ও সাবেকি ধ্যানধারণার অনুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ ক্রমশ সত্য ও যুক্তির পথকে গ্রহণ করতে শেখে। যে-কোনো জাগতিক ঘটনাকেই যে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণসিদ্ধ না হলে তা যে বিশ্বাস করা যায় না— ক্রমশ এই ধারণা মানুষের মনে দৃঢ় হতে থাকে।

আজ একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি বিজ্ঞানমনস্কতা মানবমনের সাবেকি অন্ধবিশ্বাসকে কোণঠাসা করেছে একথা সত্য। কিন্তু মানবমনে জমে থাকা অন্ধবিশ্বাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেনি। তাই আজও যখন শিক্ষক- অধ্যাপক-চিকিৎসক এমনকী বৈজ্ঞানিককেও আমরা দেখি মাদুলি, তাবিজ কিংবা গ্রহরত্ন ধারণ করতে তখন আমরা বুঝতে পারি বিজ্ঞান তাঁর

পেশা বা বৃত্তিমাত্র। কিন্তু তিনি প্রকৃত অর্থে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নন। অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্কতা প্রকৃতপক্ষে মানবমনের এমন এক সচেতনতা ও যুক্তিবোধ, যা মানুষের বৈজ্ঞানিক মনন ও চিন্তাচর্চার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং হাঁচলে দাঁড়ানো, বিড়াল ডিঙোলে রাস্তায় আটকে পড়া প্রভৃতি নানান অর্থহীন অন্ধবিশ্বাসের শেকল ভাঙতে হলে বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চায় জোর দিতে হবে। তাই বৈজ্ঞানিক মননের এই শিক্ষার আরম্ভ হওয়া উচিত অল্পবয়স থেকেই। কারণ সমস্ত অন্ধবিশ্বাসের মূলে আছে মানুষের মনে যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা ও অসচেতনতা। এই অজ্ঞানতার মোহমুক্তি ঘটিয়ে মানুষকে যুক্তি ও জ্ঞানের তীক্ষ্ণ আলোয় দীক্ষিত করতে পারলেই মানুষের ক্রমমুক্তি ঘটবে। সেইদিন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, মনের সমস্ত কুসংস্কার দূরে সরিয়ে হয়ে উঠবে যুক্তিবাদী ও মুক্তমনের অধিকারী এক সার্থক মানুষ।

রচনা—৫

পথনিরাপত্তা ও আমরা

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন মহানগরীতে, বিশেষত কলকাতায় পথনিরাপত্তার প্রসঙ্গটি বহু-আলোচিত। যানবাহন এবং নিত্যযাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে রাস্তা যেখানে অনেক কম, যেখানে প্রায়শই পথদুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বহু নতুন রাস্তা, উড়ালপুল, বাইপাস তৈরি হচ্ছে মানুষের যোগাযোগ আর যাতায়াতকে দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে। তবু দেখা যায় বহুক্ষেত্রেই জনসংখ্যা এবং যানবাহনের আধিক্য পথনিরাপত্তাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

পথচারীদের অনেকের মধ্যেই যেমন যান-নিয়ন্ত্রণের নিয়ম তথা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা দেখা যায়, তেমনই বহু চালকের মধ্যেও দক্ষতার অভাব এবং উদ্দামতা লক্ষ করা যায়। ফলে বেড়ে চলে পথ দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান।

সুষ্ঠু ও নিরাপদ জীবনযাপনের কথা ভেবে পথনিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা গড়ে তুললে বহু দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে চর্চার পরিসর গড়ে উঠলে ছাত্রছাত্রীরা অবহিত হবে। ইতোমধ্যেই শহরাঞ্চলে ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্যোগে পথনিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা-শিবির আয়োজিত হয়েছে। পথনিরাপত্তা সপ্তাহে যান-নিয়ন্ত্রণে সামিল হয়েছে বহু বিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্রছাত্রী। এভাবেই তারা জানতে পারে এবং

অপরকে জানাতে পারে পথ ব্যবহারের নিয়ম-কানুন। আশা করা যায় নিয়মিত সেগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সু-অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে সু-নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্বপালনের মধ্যে দিয়ে তারা পথ দুর্ঘটনাকে বহুলাংশে প্রশমিত করতে পারবে।

প্রতিদিন পথে দেখা যায় কত বাস, ট্যাক্সি, জিপ, মোটরসাইকেল, সাইকেল, ভ্যান, রিকশা, মালবাহী লরি, অটো, ম্যাটাডোর প্রভৃতি। অনেক রাস্তায় নির্দিষ্ট লাইনে চলাচল করে ট্রাম। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে এদের সংখ্যা এবং গতি। আর সে কারণেই নিরাপদে পথ-চলতে আজকের দিনে বড়ো প্রয়োজন ট্রাফিক সচেতনতার। যেখানে বড়ো রাস্তার পাশে ফুটপাথ আছে, তা ব্যবহার করা উচিত। যেখানে ফুটপাথ নেই সেখানে রাস্তার ডানদিক ধরে হাঁটতে হবে। গাড়ি যেদিক থেকে আসছে সেদিকে পিছন ফিরে হাঁটা অনুচিত। শিশুরা রাস্তায় হাঁটার সময় তাদের হাত ধরে অভিভাবকেরা যেন তাদের নিজেদের বাঁদিকে রাখেন সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাস্তায় কখনই অন্যমনস্ক হলে চলবে না। মোবাইল ফোনে কথা বলা, বন্ধুদের সঙ্গে দলবেঁধে চলা, গল্প করতে করতে হাঁটা বন্ধ করতে হবে।

যেসব জায়গায় রাস্তা পার হওয়ার জন্য জেব্রা ক্রসিং, সাবওয়ে, ফুটব্রিজ, ওভারব্রিজ রয়েছে — সেগুলি ব্যবহার করা উচিত। রাস্তায় চলার সময় ট্রাফিক পুলিশ বা ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলা প্রয়োজন। সিগন্যাল ব্যবস্থা না থাকলে প্রথমে ডানদিকে, তারপর বাঁ দিকে, তারপর আবার ডানদিক দেখে রাস্তা নিরাপদ মেনে হলে তবেই তা পার হওয়া উচিত। দৃষ্টি কোনোভাবে আড়ালে পড়েছে এমন পরিস্থিতিতে রাস্তা পার হওয়া উচিত নয়। এছাড়াও রাস্তায় খেলা, ছোটাছুটি করা, ছুটে রাস্তা পেরোনো, বাঁকের মুখে রাস্তা পার হওয়া কিংবা পিছল রাস্তায় অসতর্কভাবে চলা উচিত নয়।

চালকেরা যেমন সতর্কতার সঙ্গে, সিগন্যাল মেনে, নির্দেশিত গতিতে গাড়ি চালাবেন, নির্দিষ্ট স্টপেজে দাঁড়াবেন, তেমনই যাত্রীরাও অযথা চলন্ত বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়াবেন না, চলন্ত গাড়িতে ওঠানামা করবেন না, অযথা হুড়োহুড়ি না করে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করবেন।

পথে গাড়ি চালানোর আগে চালক সেটি প্রয়োজনমতো যথাযথ পরীক্ষা করে নেবেন। কখনই তাঁরা ট্রাফিক নিয়ম ভাঙবেন না, অযথা হর্ন ব্যবহার করবেন না, গাড়ি চালানোর সময় উত্তেজক পানীয় কিংবা খাবার খাবেন না, বাঁদিক দিয়ে অন্য গাড়িকে ওভারটেক করবেন না —এটাই প্রত্যাশিত। তাঁরা যেন সবসময় সেফটি বেল্ট ব্যবহার করেন। মালবাহী গাড়ির চালকেরা যেন কখনই ক্ষমতার অতিরিক্ত জিনিস বহন না করেন। বাইক আরোহীরা যেন কখনই হেলমেট ছাড়া পথে না বেরোন। প্রয়োজনমতো প্রতিটি গাড়িচালককে হাতের নির্দেশ বা ইন্ডিকেটর লাইট ব্যবহার করতে হবে।

এভাবে আমরা প্রত্যেকে যদি ট্রাফিক-এর নিয়ম মেনে চলি তাহলে আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে, কখনই আমাদের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হবে না।

আমাদের প্রতিজ্ঞা

পথ সংস্কৃতি জানব
ট্রাফিক নিয়ম মানব
আমি সতর্ক হয়ে চলব
সুস্থভাবে এগিয়ে যাব
পথকে জয় করব
শান্ত জীবন গড়ব
পথ শুধু আমার নয়
এ পথ মোদের সবার
তা সর্বদা মনে রাখব

SAFE DRIVE SAVE LIFE

- Safe Drive Save Life হবে আমার জীবনের শপথ।
- Safe Drive Save Life নিরাপদ করে পথ।
- Safe Drive Save Life হোক আমার সুস্থ চেতনা।
- Safe Drive Save Life হোক আমার স্বপ্ন সাধনা।
- Safe Drive Save Life আমার জীবন, আমার বেঁচে থাকা।
- Safe Drive Save Life হোক সবাইকে নিরাপদ রাখা।
- Safe Drive Save Life এগিয়ে চলার গান।
- Safe Drive Save Life নতুন বাঁচার আহ্বান।

- **নীচের বিষয়গুলি অবলম্বনে কমবেশি ২৫০ শব্দে প্রবন্ধ রচনা করো :**

১. প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান
২. আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার
৩. মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা
৪. একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী
৫. দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতি
৬. তোমার দৃষ্টিতে একজন আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামী
৭. ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৮. জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে ছাত্রসমাজের ভূমিকা
৯. দেশগঠন ও ছাত্রসমাজ
১০. বিদ্যালয় জীবনে খেলাধূলার ভূমিকা
১১. তোমার প্রিয় খেলা
১২. বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে ভারত
১৩. কোপা আমেরিকা ২০১৫
১৪. রিও অলিম্পিক্স ২০১৬